জিহাদের দিকে আহবানকারী দায়ী ভাইদের প্রতি বিশেষ নসিহত

দাওয়াতের পদ্ধতি ও জিহাদি মানহাজের হেফাযত

উস্তাদ উসামা মাহমুদ حفظه الله

জিহাদের দিকে আহবানকারী

দায়ী ভাইদের প্রতি বিশেষ নসিহত

দাওয়াতের পদ্ধতি

ও

জিহাদি মানহাজের হেফাযত

মূল

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ

আহনাফ শাকের

সূচিপত্র

প্রথম কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা এবং যথাযথ তা'রীফ আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য, দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। অতঃপর, আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহে জিহাদের দিকে আহ্বানকারীগণ, বিশেষকরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জিহাদের দাওয়াতের খেদমত কারীগণকে উদ্দেশ্য করে সম্মানিত শাইখ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহর এর বার্তা "দাওয়াতের পদ্ধতি এবং জিহাদের মানহাজের হেফাজত" "নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ" ম্যাগাজিনে কিস্তি আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রচার হওয়ার পর একত্রে একটি বই আকারে দায়ী এবং মুজাহিদীন ভাইদের সামনে রয়েছে। হযরত শাইখ উসামা মাহমুদ (মাদ্দা জিল্লুহু) এই লেখাতে নিজে বলেন,

"আমরা যেমন মুজাহিদ তেমনি দ্বীন ও জিহাদের দায়ীও, একই সময়ে কিতালের দায়িত্ব আমাদের, দাওয়াতের দায়িত্বও আমাদের। যে শক্তিগুলো অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর কুফরি নেজাম চাপিয়ে রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যেমন অস্ত্র তুলে যুদ্ধের ময়দানে দাড়িয়ে গেছি, তেমনি উম্মতে মুসলিমাহকে এ সকল জালেমদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের দাওয়াতও আমরা দিচ্ছি। যুদ্ধের ময়দানকে আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি আর দাওয়াতের ময়দানকে আবশ্যক মনে করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে কঠোর ছিলেন, রক্ত প্রবাহিত করেছেন, মাথা দ্বিখণ্ডিত হওয়াকে এবং দ্বিখণ্ডিত করতে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সীরাত সাক্ষ্য দেয় 'দাওয়াতের ময়দানে তাঁর মোবারক নীতি কঠোরতা নয়, বরং নম্রতা'।"

আমরা উম্মতে ওসাতাহ তথা মধ্যপন্থী উম্মাহ, দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে ইনসাফের উপর চলা এক জাতি। এই মধ্যপন্থা এবং ইনসাফের ব্যাপারে উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। এবং এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, দাওয়াতের উদ্দেশ্য এবং উপকারী নীতি কি? এবং দাওয়াতের সেই পদ্ধতিটি কি, যা স্বয়ং জিহাদি আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর এবং যার দ্বারা উল্টো শত্রুদের ফায়দা হয়? এমনভাবে শাইখ দাওয়াতের পথ থেকে জিহাদি

আন্দোলনে জোড়া লাগানো এবং যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের চিহ্নিত করতে এবং তাদের সামনে বাধা তৈরি করতে এমন কিছু বিষয় আলোচনা করেছেন, যার দ্বারা ইনশাআল্লাহ জিহাদি মানহাজের হেফাজতও হবে এবং উন্নতিও হবে।

মুহতারাম উস্তাদ প্রথম দিকে আলোচ্য বিষয়গুলোর কিছু অংশকে তুলনামূলক বিস্তারিত করেছেন। এবং শেষে জিহাদের দায়ীগণের খেদমতে কিছু আর্জি, কয়েকটি শিরোনামের অধীনে পয়েন্ট আকারে অতি সহজ এবং সকলের বোধগম্য করে আলোচনা করেছেন। এসকল পয়েন্ট লেখাটির ফায়দা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এই লেখাটিকে ব্যাপকভাবে জিহাদ ও দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে এবং বিশেষভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যারা জিহাদের দাওয়াহ দিচ্ছেন তাদের জন্য উপকারী করে দেন, আমীন। দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আর আমাদের শেষ প্রার্থনা, সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালকের জন্য।

সম্পাদক
নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ
জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪১ হিজরি
জানুয়ারি ২০২০ ইংরেজি

কিছু পদ্ধতি এমন যা দাওয়াতের জন্য ক্ষতিকর!

এবিষয়ে আলোচনা করার আগ্রহ তৈরী হয়েছে ইন্টারনেটে জিহাদের প্রতি দাওয়াত বিষয়ক কিছু পেইজ দেখে। এসকল পেইজের পরিচালকগণ একদিকে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কারণ তারা এই চতুর্মুখী ফেতনার সময়ে জিহাদের দিকে দাওয়াতের ঝান্ডা উঁচু করে বাতিলের বিরোধিতা করছে। এমনকি তারা এই বাতিল শাসনব্যবস্থা দূর করার উপায় একমাত্র জিহাদকেই সাব্যস্ত করেছে। এদিক থেকে তাদের যত প্রশংসাই করা হোক না কেন তা কম হবে। কারণ, বর্তমানে যেখানে 'যামানার ফেরাউনদের' অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার এবং তাদের মন জয় করার জন্য বড় বড় ব্যক্তিরাও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। সেখানে এই ভাইয়েরা জালেমদের প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে, নিজেদের জান হাতে নিয়ে তাদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে।

সেই সাথে জিহাদের দাওয়াতের বিরোধিতাকারীদেরকে তাদের পক্ষ থেকে দেওয়া খন্ডন দেখে তাদের ইখলাসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ভাইদের ইখলাসের সামনে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা ঝুঁকে যায়। কিন্তু তার পরিণতি দেখে অতি আফসোসের সাথে বলতে হয় - এই সম্মানিত ভাইদের কারো কারো দাওয়াতের পদ্ধতি ও খণ্ডনের তরিকা মোটেও সঠিক নয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কাফেরদের সাথে পর্যন্ত হেকমত, উত্তম নসিহত ও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আলোচনা-পর্যালোচনা ও মুনাযারা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফেরাউনের সাথে পর্যন্ত দাওয়াতের ক্ষেত্রে নরম ব্যবহারের তাকিদ করেছেন। কিন্তু এসমস্ত পেইজে কি আম কি খাস, উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোকদের ব্যাপারেও অত্যন্ত কঠিন এবং বিদ্রূপাত্মক কথা লেখা হয়। যেই সমস্ত মতবিরোধকারীদেরকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টার দরকার ছিলো, তাদেরকে এমনভাবে সম্বোধন করা হয় যাতে কোন ধরনের সহানুভূতি ও কল্যাণকামীতার ঘ্রাণও থাকে না।

যে কোন মুসলমানকেই নিন্দা করা, বিদ্রূপ করা, অভিশাপ দেয়া হারাম। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন এটাই এক্ষেত্রে দাওয়াতের আসল পদ্ধতি। যে ব্যক্তি একশতে একশ আমার মত সমর্থন করবে সে আমার আপন, আর যে সামান্য একটু বিরোধিতা করবে সেই দুশমন!!! তার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারেই সন্দেহ! তাকফিরে মুআয়্যিন

(তথা নির্দিষ্টভাবে কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা) এর কাজ যা গভীর ইলমের অধিকারী, বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞার অধিকারী আলেমদের কাজ, এখানে তা খুব হালকাভাবে দেখা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের উপর খুব সহজেই কুফুরির ফতোয়া দিয়ে দেয়া হয়। এখানে বিরোধিতাকারী দ্বীনদারদের প্রতি কল্যাণকামীতা নেই, কোন হারাম কাজে সতর্ক করেই ক্ষান্ত হওয়া নেই। আছে শুধু গালিগালাজ, নিন্দা, বিয়ে ভেঙে যাওয়ার হুমকি এবং তাদেরকে সরাসরি ক্ষতি করার চেষ্টা। তাদের ব্যাপারে এমন এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা মুখে আনাও অসম্ভব। নব্য মুরজিয়া, ধর্মীয় হিজড়া এমন আরও অশ্রাব্য কথাবার্তা!!

হে আল্লাহ! এ কেমন দাওয়াত!!? এরা কীভাবে মনে করে যে, তাদের দ্বারা ইসলামের কোন খেদমত হতে পারে! দাওয়াতের এ পদ্ধতি আইএস এর আত্মপ্রকাশের পূর্বেও অনেক জোরেশোরে চালু ছিলো। যখন আইএস আত্মপ্রকাশ করল তখন জিহাদের পথে আহবানকারী এই সকল দা'য়ীগণ এই ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে এর প্রভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিরাও এই ফেতনায় লিপ্ত হয়ে গেলো। খুব কম সংখ্যক লোকই প্রকাশ্যে এই খারেজীদের দলভুক্ত হওয়া থেকে মুক্ত ছিল।

বাস্তবতা হলো দাওয়াত ও জিহাদের সফরে কলব যখন ইনসাফ থেকে সরে যায় - তখন বিনয় অহংকারে, ভাষার শালীনতা অশালীনতায় রূপান্তরিত হয়। এবং অন্তরের নম্রতা কাঠিন্যতার রুপ ধারণ করে। তারপর সে ব্যক্তি নিজেও গোমরাহীর পথে চলে এবং অন্যকেও গোমরাহীর পথ প্রদর্শন করে।

আমি অত্যান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলছি, এই ভাইরা বিষয়টি বুঝুক আর আর না বুঝুক, ইতিহাস সাক্ষী এই ধরণের দাওয়াতের দ্বারা জিহাদের খুব কমই ফায়দা হয়েছে। কারণ এখানে দাওয়াত কম আর লোকদেরকে জিহাদ থেকে বিমুখ করা হয় বেশি। এ ধরণের দাওয়াত জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকেও অনেক সময় পথভ্রষ্ট করে দেয়। এবং তাদেরকে সীমালঙ্ঘন ও তাকফিরের অন্ধকারে নিমজ্জিত করার মাধ্যম হয়।

আমি আবারও বলছি, উল্লেখিত ভাইদের ইখলাস নিয়ে কোন কথা বলছি না। কিন্তু শুধুমাত্র ইখলাস মোটেও যথেষ্ট নয়। ইখলাসের সাথে সাথে আমাদের ফিকির ও আমল সুন্নত অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। আল্লাহর কাছে যেই ইখলাস গ্রহণযোগ্য তা

হলো, আমরা হক্ক জেনে তার সামনে আমাদের মাথা ঝুঁকিয়ে দিব। আত্মসমালোচনা হবে আমাদের মূলভিত্তি। আমাদের কথা ও কাজ যেন শরীয়ত অনুযায়ী হয়, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এর বিপরীতে আমরা যদি ওইসমস্ত কাজকে সঠিক বলি, যাকে আমাদের অন্তর সঠিক বলে - তাহলে তা ওই ইখলাস নয় যা আল্লাহর নিকট নাজাতের মাধ্যম। বরং এটা হবে নফসের চাহিদা পূরণ - যা সমস্ত খারাবির মূল। নফসের অনুসরণ মানুষকে গোমরাহী ও অপবিত্রতার এমন গভীরে পৌঁছে দেয়, যার পরিণতি দুনিয়াতে পশুত্ব এবং আখেরাতে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন। আল্লাহ আমাদেরকে নফসের চাহিদা অনুযায়ী চলা থেকে হেফাযত করুন। দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিজেকে শরীয়তের অনুগামী করে রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সুতরাং জিহাদের পথে আহবানকারী দা'য়ীগণের জন্য জরুরী হল, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দাওয়াতের পদ্ধতি বুঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহর মনোনীত পদ্ধতিতেই জিহাদের খেদমত হতে হবে। অতএব দাওয়াতের ওই পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকতে হবে যা দাওয়াতের কোন পদ্ধতিই নয়, এবং যার দ্বারা জিহাদের খেদমতের চাইতে ক্ষতিই বেশি হয় ।

দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা যেখানেই দাওয়াতের আদেশ করেছেন **(ادع الى سبيل ربك)** অর্থাৎ দ্বীন ও দ্বীনের কাজের প্রতি দাওয়াতের কথা বলেছেন, সেখানে তার পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। এ পদ্ধতি হলো হেকমত, উত্তম ওয়াজ নসিহত এবং আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে মুনাযারা করা।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থ: “আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।” [সুরা নাহল ১৬:১২৫]

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন:

এই আয়াতে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, কীভাবে আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছেন –

১. হেকমত

২. মাওয়ায়েযে হাসানা

৩. জিদালে হাসানা।

প্রত্যেকটির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. হেকমত:

হেকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - খুব মজবুত বিষয়ও অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে, প্রজ্ঞার সাথে উপস্থাপন করা। যা শুনে বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ও ইলম পিপাসু আলেমগণ মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। জাগতিক দর্শন তার সামনে ম্লান হয়ে যায়। হেকমত দ্বারা ওহী থেকে প্রাপ্ত কোন বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করা বুঝায়, যেন জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে কোন ধরনের খুত কেউ ধরতে না পারে।

২. মাওয়ায়েযে হাসানা:

অন্তর নরমকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী নসিহতকে মাওয়ায়েযে হাসানা বলে। এর মধ্যে ভাষামাধুর্য থাকবে, সেই সাথে অন্তরবিগলিত করার মতো প্রাণও থাকতে হবে। ইখলাস, সহমর্মিতা, দয়া ও উত্তম আখলাকের সাথে সুন্দরভাবে কৃত নসিহত দ্বারা পাথরের মত শক্ত অন্তরও মোমের মত গলে যায়। মৃতও প্রাণ ফিরে পায়, নিরাশাগ্রস্ত জাতি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাড়ায়। উৎসাহ ও ভীতিপ্রদর্শনমূলক ওয়াজ

শুনে জান্নাতের দিকে অস্থির চিত্তে দৌড়ানো শুরু করে। বিশেষ করে যাদের অন্তর হক্কের জযবায় ভরপুর, কিন্তু উঁচু চিন্তা-চেতনা ও বেশি মেধার অধিকারী নয়, তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী ওয়াজ নসিহত দ্বারা আমলের জন্য এমন এক আগ্রহ তৈরি করা যায় যা উঁচু স্তরের গবেষণালব্ধ ইলমী তাহকিকের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

তবে, দুনিয়াতে একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা সবসময় সব বিষয়ে নাক গলায়। এরা প্রত্যেক কথায় প্যাঁচ ধরে আর অযথা তর্ক করে। এসমস্ত লোকেরা হেকমতপূর্ণ কথা শোনে না, ওয়াজ নসিহতও কবুল করে না। তারা চায় সব বিষয়েই তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকুক।

৩. জিদালে হাসানা:

অনেক সময় বুঝমান, সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিকেও সন্দেহ ঘিরে ধরে। আলোচনা ছাড়া তারও এতমিনান হয়না। তাদের জন্য হল জিদালে হাসানা। যা আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ অর্থাৎ যদি এমন পরিস্থিতি হয় তাহলে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ভদ্রতা, সঠিক দিকনির্দেশনা ও ইনসাফের সাথে মুনাযারা করবে। প্রতিপক্ষকে কোন অভিযোগ দিলে উত্তম পদ্ধতিতে দিবে। অযথা অন্তরে আঘাতকারী কথাবার্তা বলে ঝগড়ার পরিবেশ তৈরি করবে না। বিষয়টি এমনভাবে পেশ করতে হবে যেন অনেক দূর পর্যন্ত না গড়ায়। লোকদেরকে বুঝানো ও সত্য প্রতিষ্ঠা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। কঠোরতা, খারাপ ব্যবহার, চাপাবাজি ও গোয়ার্তুমি দ্বারা কোন ফায়দা হয় না।

মুফতি শফি রহিমাহুল্লাহ দাওয়াতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে আম্বিয়ায়ে কেরামের তরীকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আল্লাহর পথে আহবান মূলত নবীগণের কাজ। উলামায়ে কেরাম এ দায়িত্ব পালন করেন নবীদের নায়েব বা প্রতিনিধি হিসেবে। এজন্য জরুরী হলো দাওয়াতের পদ্ধতি ও আদবও নবীদের থেকে শিখে নেওয়া। যে দাওয়াত তাদের তরীকার উপর থাকবে না, তা দাওয়াতই না, বরং তা লড়াই বা ঝগড়ার কারণ হয়ে দাড়াবে। নববী দাওয়াতের মূলনীতি কেমন সেটা আমরা মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামকে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে শিখে নিতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

অর্থাৎ ফেরাউনের সাথে নরম কথা বল, হয়ত সে বুঝবে অথবা ভীত হবে। [সুরা ত্বা-হা ২০:৪৪]

প্রত্যেক দাঈর সর্বদা এ বিষয়টি মাথায় রাখা উচিৎ যে, ফেরাউনের মত অহংকারী কাফের, যার মৃত্যুও আল্লাহর ইলম অনুযায়ী কুফর অবস্থায়ই হবে - তার ক্ষেত্রেও আল্লাহ নিজের দাঈকে নরম ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে বলেছেন "নরমভাবে দাওয়াত দিবে"।

বর্তমানে আমরা যাদেরকে দাওয়াত দিই, তারা কেউ ফেরাউনের চেয়ে বড় গোমরাহ নয়। আর আমাদের কেউ মূসা ও হারুন আলাইহিস সালামের মত পথপ্রদর্শকও নই। তো যেই অধিকার আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুই নবীকে দেননি যে, "মাদউর সাথে শক্ত ব্যবহার করবে, তাকে অপমান করবে" - সে অধিকার আমাদের কোথা থেকে অর্জন হয়ে গেলো?!!!

কুরআনে কারীমে নবীগণের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং কাফেরদের সাথে মুনাযারার আলোচনা অনেক আছে। কোথাও দেখা যায় না যে, ইসলামের বিরোধিতাকারীদের জবাবে কোন নবী কখনও কোন শক্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এবিষয়েও খেয়াল রাখতেন যে, মাদউর অপমানও যেন না হয়। তাই কাউকে যদি তিনি কোন ভুল বা অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখতেন, তখন তাকে কিছু না বলে সাধারণ মজলিসে বলতেন – "লোকদের কি হলো যে, তারা এমন এমন করে?"। এই সাধারণ সম্বোধনে যাকে শোনানোর উদ্দেশ্য সেও শুনতো এবং নিজের সংশোধনের ফিকিরে লেগে যেত।

সাধারণত নবীগণের অভ্যাস ছিলো শ্রোতাকে লজ্জা থকে বাঁচানো। তাই অনেক সময় যে কাজ শ্রোতার দ্বারা সংঘটিত হতো তা নিজের দিকে নিসবত করে সংশোধনের চেষ্টা করতেন। সূরা ইয়াসীনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর এবাদত করবো না? [সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২২]

এটা তো জানা কথা যে, (আয়াতে উল্লেখিত এই দূত সর্বদা আল্লাহর ইবাদতেই লিপ্ত থাকতো, শুধু কাফের শ্রোতাকে শুনানোর উদ্দেশ্যই এই কাজকে নিজেদের দিকে নিসবত করে বলেছেন।

দাওয়াতের উদ্দেশ্য শুধু অন্যের সমালোচনা করা নয়, বরং অন্যকে নিজের কাছে ডেকে আনা। আর এই ডাকা তখন কার্যকর হবে যখন বক্তা-শ্রোতা উভয়ের মাঝে কোন একটি বিষয়ে একাত্মতা থাকবে। এজন্য পবিত্র কুরআনে নবীগণের দাওয়াতের অধিকাংশই **يا قوم** 'ইয়া কওম' (হে আমার সম্প্রদায়!) শিরোনামে এসেছে। নবীগণ "হে আমার সম্প্রদায়" এই শব্দের দ্বারা প্রথমেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর তাদের সংশোধনের আলোচনা করেছেন যে, – "আমরা তো ভ্রাতৃত্বের দিক থেকে একই জাতের মানুষ, আমাদের মাঝে তো কোন দূরত্ব নেই"। একথা বলেই তাদের সংশোধনের কাজ শুরু করতেন।

রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের বাদশার নামে যে চিঠি পাঠিয়েছেন, তাতে তাকে 'আযীমুর রোম' তথা রোমের সম্মানিত বাদশা উপদিতে সম্বোধন করেছেন। এখানে তাকে "রোমের সম্মানিত বাদশা" বলে সম্মান করেছেন। আর এই 'আযীমুর রোম' শব্দটি আল্লাহর রাসুল রোমের বাদশার জন্য ব্যবহার করে তার সম্মানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার এই সম্মানের স্বীকৃতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের অধিবাসীদের জন্য দিয়েছেন, নিজের জন্য নয়। তারপর কোরআনের নিম্মোক্ত আয়াতাংশটি শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করে দাওয়াত দিয়েছেন।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ

অর্থ: `হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবো না। [সুরা ইমরান ৩:৬৪]

এখানে প্রথমে পরস্পরের একমত হওয়ার একটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর খ্রিস্টানদের ভুলগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সীরাহ নিয়ে যদি ফিকির করা হয়, তাহলে তালীম ও দাওয়াতের এধরণের অনেক আদাব ও উসুল পাওয়া যায়। বর্তমানে তো

দাওয়াত ও ইসলাহ এবং আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের কোন খেয়ালই নেই। আর যারা দাওয়াতের কাজে লিপ্ত আছে, তারা শুধু বাহাস-মুনাযারা, তর্ক-বিতর্ক, প্রতিপক্ষকে অভিযোগ করা, কথায় আটকানো এবং তাকে অপমান করাকেই দাওয়াত বানিয়ে নিয়েছে। যা সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে কখনই প্রভাব বিস্তারকারী ও উপকারী হয়না। তারা মনে করে আমরা ইসলামের অনেক খেদমত করে ফেলেছি। বাস্তবে তারা মানুষকে দূরে সরানোর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উক্ত আয়াতের তাফসীর থেকে জানা যায় যে, ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া। আর এই দাওয়াতের মূলনীতি দুইটি - হেকমত এবং মাওয়ায়েযে হাসানা। তর্ক যদি করতে বাধ্য হয় তাহলে সেখানে ‘আহসান’ তথা উত্তম পন্থায় করার শর্তসহ জায়েজ বলেছেন। কিন্তু এটি দাওয়াতের কোন স্বতন্ত্র বিভাগ নয়, বরং এটি দাওয়াতের নেতিবাচক দিকেরই একটি প্রচেষ্টা; এক্ষেত্রে কুরআনে কারীমে **بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** এর শর্ত লাগিয়ে একথা বলে দিয়েছেন যে, দাওয়াত কোমলতার সাথে কল্যাণকামীতা ও সহমর্মিতার আগ্রহ নিয়ে হওয়া উচিৎ। সেই সাথে শ্রোতার অবস্থা অনুযায়ী স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে হওয়া উচিৎ। শ্রোতাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা থেকে পরিপূর্ণ বেঁচে থাকতে হবে।

এরপর দাওয়াত ‘আহসান’(সর্বোত্তম) হওয়ার জন্য জরুরী হলো বিষয়টি বক্তার জন্য ক্ষতিকর না হওয়া। অর্থাৎ দাওয়াতের মধ্যে বদ-আখলাক তথা হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, পদমর্যাদার লোভ ইত্যাদির মিশ্রণ থাকতে পারবে না, যা বাতেনি কবিরা গুনাহ। আর বর্তমানে খুব কম মানুষই আছে যারা বাহাস-মুনাযারার মধ্যে এ সমস্ত খারাবী থেকে বেঁচে থাকতে পারে। অধিকাংশই বেঁচে থাকতে পারে না। ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহ বলেন: “যেমনিভাবে মদ পান করা সমস্ত খারাবীর মূল - নিজের আত্মিক খারাবী এবং বহু শারীরিক খারাবীর জন্ম দেয়, তেমনিভাবে তর্ক বিতর্কের মধ্যে যদি উদ্দেশ্য থাকে অপর পক্ষের উপর বিজয়ী হওয়া, নিজের ইলমকে অন্যের সামনে প্রকাশ করা, তাহলে এটাও অন্তরের সমস্ত খারাবীর মূল। কারণ এর দ্বারা অন্তরে অনেক রোগ সৃষ্টি হয়। হিংসা, বিদ্বেষ অহঙ্কার, গিবত, অন্যের দোষ তালাশ করা, অন্যের দুঃখে খুশি হওয়া, অন্যে সুখে কষ্ট পাওয়া, সত্য গ্রহণে অহঙ্কার পোষণ ইত্যাদি গোনাহের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও এই জাতীয়

রোগে আক্রান্ত লোকেরা অপরপক্ষের কথায় চিন্তা-ফিকির বাদ দিয়ে পাল্টা উত্তর দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয় - তাতে কুরআন হাদীসের যত তাবীলই করা লাগুক না কেন, তাই করে বসে। এটা তো এমন ধ্বংসাত্মক বিষয় যাতে মর্যাদাবান আলেমরাও লিপ্ত হয়ে পড়ে, এরপর বিষয়টি যখন তাদের অনুসারীদের পর্যন্ত পৌঁছে তখন তা ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারির রূপ ধারণ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন –

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

অর্থ: আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। [সুরা নাহল ১৬;১২৫]

ইমাম রাজি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের অধীনে বলেন: "এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো তোমরা শুধু এই তিন তরীকায় দাওয়াত দেয়ার জন্য আদিষ্ট। মানুষের হেদায়াত দেয়া তোমাদের কাজ নয়। আল্লাহই ভালো জানেন কে গোমরাহ, আর কে হেদায়াত গ্রহণকারী। আমার মতে নফস বা অন্তর সত্তাগতভাবে বিভিন্ন ধরণের হয়। প্রথমত কিছু নফস বা অন্তর নূরে পরিপূর্ণ ও পাক পবিত্র, যা বস্তুর দিকে কম ধাবিত হয়, আর রুহানিয়াতের দিকে বেশি ধাবিত হয়। আর কিছু অন্তর অন্ধকারে পরিপূর্ণ - যা বস্তুর প্রতি আগ্রহী বেশি, আর রুহানিয়াতের দিকে ধাবিত হয় কম। সুতরাং যার অন্তরাত্মা যেমন সে তার বিপরীতটা খুব কমই গ্রহণ করে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন - তোমরা তিন তরীকায় দাওয়াত দাও। আর সব মানুষের হেদায়াতের পিছনে পরে থেক না। আল্লাহ পথভ্রষ্টদের গোমরাহী এবং পবিত্র অন্তরের পবিত্রতা সম্পর্কে ভালো জানেন।"

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ বলেন: "আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের জন্য মানুষের সাথে মুহাব্বত সৃষ্টি কারী লোকের প্রয়োজন। এমন লোক

যার মন বড় ও জবান পবিত্র। কোন মুসলমানকে কোন খারাপ কাজ করতে দেখলে একথা বলবেনা যে, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করি, কারণ তুমি এই এই খারাপ কাজ কর। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করো না। বরং তাকে এভাবে বল; আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি, কিন্তু তোমার অমুক কাজটা খারাপ, তা পরিত্যাগ করা উচিৎ।”

শহীদে উম্মাত শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছেন: “জিহাদি মিডিয়ায় এমন শব্দ, বাক্য ও কথা, বলা এবং লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে যা একজন মুসলমানের শানের খেলাফ। যে কোন মুসলমানের সাথেই ঘৃণা, গালিগালাজ, ভাষার ভুল ব্যবহার উচিৎ নয়। মিডিয়ায় লেখা বা বলার সময় শরয়ী নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। এ বিষয়টি দেখতে হবে যে, আমাদের এই কথা দ্বারা জিহাদের ফায়দা হবে? না ক্ষতি হবে? আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে, মুজাহিদদের জন্য এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখা কত জরুরী। আমার খেয়াল হলো এখনই আমাদের সমস্ত মিডিয়াগুলোকে কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে। কারণ এই মিডিয়াই উম্মত পর্যন্ত আমাদের আওয়াজ পৌঁছায় এবং উম্মতের সাথে আমাদের সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম। এই মিডিয়াই আমাদেরকে উম্মতের সামনে তুলে ধরে। এজন্য জরুরী হলো আমাদের মিডিয়া উম্মতের বুঝ অনুযায়ী হবে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশায় সহানুভূতি জানাবে। তেমনিভাবে আরেকটি বিষয় মিডিয়ার ভাইদের জন্য জরুরী, তাদের প্রকাশনাগুলো যেন সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে হয়। উম্মাহকে অন্ধকারের গভীরতা থেকে বের করে নিয়ে আসার ফিকির তাদের মধ্যে থাকতে হবে।”

মুজাহিদ আলেমে দ্বীন শায়েখ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: “মুজাহিদ নেতাদের জন্য জরুরী হলো নিজেরা এই গুণ অর্জন করবে, এবং নিজ সাথীদেরকে এমন তরবিয়ত করবে যে, তারা যেন মানুষের উপর দয়াকারী ও সহজকারী হয়। তাদের ভুল-ত্রুটি ও অন্যায় দেখে শাস্তি, হত্যা ও প্রতিশোধের হুমকি প্রদানকারী না হয়। বরং কোমলতা ও নমনীয়তার সাথে ধীরে ধীরে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন জামাত পাঠাতেন বা কাউকে কোন দলের আমীর বানাতেন তখনই নসিহত করতেন:

يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا متفق عليه

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না এবং (লোকদেরকে) সুসংবাদ দাও। তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না।'' [বুখারি ৬৯, ৬১২৫, মুসলিম ১৭৩৪, আহমদ ১১৯২৪, ১২৭৬৩]

আমরা কি কখনও এটা নিয়ে চিন্তা করেছি? এর উপর আমল করেছি?" আল্লাহ এ সমস্ত উলামায়ে কেরাম ও জিহাদের নেতাদেরকে সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে যথাযথ প্রতিদান দান করুন। এবং আমরা যেন সুন্নত অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করতে পারি সে তাওফিক দান করুন। আমীন।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

আমরা মুজাহিদগণ দ্বীন ও জিহাদের দা'য়ী। জিহাদও আমাদের ময়দান, একই সাথে দাওয়াতও আমাদের ময়দান। যে সমস্ত শক্তিধর ব্যক্তিরা অস্ত্র দিয়ে আমাদের উপর কুফুরী শাসণব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র নিয়ে ময়দানে আছি, এবং মুসলিম জাতিকে আমাদের সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার প্রতি আহবানও জানাচ্ছি। জিহাদের ময়দানের চাহিদা ভিন্ন, আর দাওয়াতের নিয়মনীতিও ভিন্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম জিহাদের ময়দানে কঠোরতা করেছেন, রক্ত প্রবাহিত করেছেন, হত্যা করা ও নিহত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সিরাত সাক্ষী যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর তরীকায় কোনো কঠোরতা নেই বরং কোমলতা। কারণ হলো দাওয়াত ও জিহাদ উভয়টির মাধ্যম, পদ্ধতি ও টার্গেট ভিন্ন ভিন্ন। জিহাদের মধ্যে শক্তিকে শক্তির মাধ্যমে দমন করতে হয়। অস্ত্র বহন করা, রক্ত প্রবাহিত করা, শরীরের অঙ্গ উড়িয়ে দেয়া টার্গেট হয়। এজন্য জিহাদে অত্যন্ত কঠোরতা দরকার। জিহাদ তো এই কঠোরতারই নাম, এটা ব্যতিত জিহাদ জিহাদই থাকে না। আর এখানে কঠোরতার মধ্যেই সাওয়াব। এটা ভিন্ন কথা যে, শরীয়ত এক্ষেত্রেও সীমারেখা ও আদাবের উল্লেখ করেছে। কিন্তু এটি কঠোরতারই ময়দান। এখানে প্রভাব বিস্তারের জন্য কঠিন শব্দ, কঠোর আচরণ জরুরী। কিন্তু এই কঠোরতা যদি

দাওয়াতের ক্ষেত্রে চলে আসে, এখানেও যদি কথা ও ভাব এমন গ্রহণ করা হয় যে, যাতে শ্রোতার মন-মস্তিষ্ক উদ্বুদ্ধ না হয়ে, বরং হিংসা, শত্রুতা, প্রতিশোধের প্রতি ধাবিত হয়, তাহলে এর দ্বারা দাওয়াতের উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। জিহাদি আন্দোলনের দুর্ভাগ্যই হবে যদি জিহাদের পদ্ধতি দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু হয়।

একদিকে জিহাদ অন্তরের রাগ-গোস্বা দমনের জায়গা। সেখানে আক্রমণ করে জালিম অহংকারীদের মস্তিষ্ক চূর্ণ করা হয়। আর তাদের বস্তুগত শক্তি খতম করে তাদের যুদ্ধ করার শখ মিটিয়ে দেয়া হয়। অন্যদিকে দাওয়াতের বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে রাগ ও গোস্বা প্রকাশ না করে বরং দমন করা হয়। শ্রোতাকে নিচু করা অপমান করা মূল উদ্দেশ্য না। তাকে আগ্রহী করা, নিকটবর্তী করা, তার মনে জায়গা করা হল উদ্দেশ্য। দলিলভিত্তিক আলোচনা, ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা, কোমলতা, এহসান ও দয়াই হলো দাওয়াতের ময়দানের চাহিদা। দাওয়াতের ময়দানে জরুরী হলো নিজে যথাযথ আমল করবে। কিন্তু শ্রোতাকে হক বুঝানো, হক বুঝের যোগ্য হওয়া ও গ্রহণীয় হওয়ার জন্য (শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে) যথেষ্ট চেষ্টা করবে। এই কারণে দাওয়াতের মধ্যে সুন্দর সুন্দর কথা, সুন্দর তরীকার প্রতি লক্ষ রাখা হয়। শ্রোতা যদি শত্রুতা ও বিরোধিতার প্রকাশ করে তাহলে দাঈ শত্রুতা করবে না, বরং সে (সর্বোত্তমভাবে মুনাযারা) এর উপর আমল করবে।

ঝগড়া- ফাসাদের জায়গায়ও তাকে এই আয়াত রাস্তা দেখায়। ভালো খারাপ এক হতে পারে না। আপনি শক্ত কথার জবাব এমনভাবে দিবেন যা খুব ভালো। এমন করার দ্বারা দেখবেন যে, যার সাথে শত্রুতা ছিলো সে কেমন যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে। আর ধৈর্যশীলরাই এটা অর্জন করতে পারে, ভাগ্যবানদেরই এটি অর্জিত হয়। সুতরাং প্রচণ্ড বাকবিতন্ডার মধ্যেও দাঈর দৃষ্টি দলিল থেকে সরে না। এই অবস্থায়ও সে সুন্দর কথা সুন্দর ব্যবহার করে, খারাপ আচরণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। এমনিতেই যখন খারাপ আচরণের জবাব ভালো আচরণ দ্বারা দেয়া হয়, বাড়াবাড়ির জবাব ক্ষমা, ইনসাফ ও দয়া দ্বারা দেয়া হয়, তখন শ্রোতার পাথরের মত শক্ত অন্তরও মোমের মত গলে যায়। শত্রুতার আগুন ঠান্ডা হয়ে যায়। এভাবেই দাঈর জানের দুশমনও তার রক্ষক হয়ে যায়।

দাওয়াতের মানহাজ ও পদ্ধতি

দাঈর সফলতা অর্জনে তিনটি বিষয় ঠিক রাখা জরুরী।

১) ওই দৃষ্টিভঙ্গি বা আকীদা-বিশ্বাস যার দিকে সে দাওয়াত দিচ্ছে।

২) দাঈর কথা ও কাজ তার দাওয়াত অনুযায়ী থাকা।

৩) দাওয়াতের পদ্ধতির মধ্যে সে কোন আখলকের সাথে দাওয়াত দিচ্ছে।

এমনিতেও এই তিনটি বিষয় পরস্পর একটি আরেকটির সাথে মিল আছে।

কারণ দৃষ্টিভঙ্গি যা হবে, ফিকির ও আমলের তরীকায়ও তারই প্রভাব পড়বে, তারই ঘ্রাণ দাওয়াতের মধ্যেও পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছু জায়গায় এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন ফিকির ও প্রভাব ভালো কিন্তু দাওয়াতের মধ্যে কঠোরতা থাকে। সুতরাং দাঈর ফরজ তখনই আদায় হবে, যখন এই তিনটি বিষয় বাড়বাড়ি ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত হবে। এমন যদি হয় তাহলে দাঈ আল্লাহর কাছে কামিয়াব হবে, আল্লাহ যদি চান তাহলে তার দাওয়াত কার্যকর হয়ে শ্রোতাদের অন্তরে প্রবেশ করবে। এর বিপরীতে দাঈ যদি এমন তরীকা অবলম্বন করে, যা তার দাওয়াতের সাথে মিলে না - তাহলে সে নিজের ধারণায় যদিও হকের দাওয়াত দিচ্ছে, কিন্তু তরীকা সুন্নত অনুযায়ী না হওয়ার কারণে, তার শক্ত ব্যবহারের কারণে খুব কম মানুষই ফায়দা পাবে। এই ধরণের দাওয়াত মানুষের থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়। কোন দাওয়াত ব্যর্থ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, দাওয়াত প্রদানকারী নিজেই দাওয়াতের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে দাড়ায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন –

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

অর্থ: হে চাদরাবৃত! (১) উঠুন, সতর্ক করুন, (২) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষনা করুন, (৩) আপন পোশাক পবিত্র করুন (৪) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৫) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না। (৬) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে সবর করুন। (৭) [সুরা মুদ্দাসসির ৭৪;১-৭]

মুমিনের জন্য নিজের কথাবার্তার সংশোধন খুব জরুরী। কারণ কথাবার্তার সংশোধনের মাধ্যমেই অন্তর ও আমলের সংশোধন হয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদেরকে খুব সুন্দর ভাষায় কথা বলার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

অর্থ: আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৩) [সুরা আল-ইসরা ১৭;৫৩]

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে কথা বলার ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ভদ্রতা বজায় রাখতে বলেছেন, কথায় যাতে জুলুম না থাকে।

আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ করেছেন –

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ

অর্থ: যখন তোমরা কথা বল তখন ইনসাফের সাথে বল। [সুরা আন-আনআম ৬;১৫২]

তাই আমরা যখন কথা বলবো তখন ইনসাফের সাথে বলবো। এই দ্বীনের দাঈর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, সে এই ঘোষণা দেয়; কেউ এই দ্বীনের চাহিদা পূরণ করুক বা না করুক আমিই সবার পূর্বে পূরণ করবো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতি পালক আল্লাহরই জন্যে।তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। [সুরা আন-আনআম ৬;১৬২]

সুতরাং দাঈ সর্বদা চেষ্টা করবে নিজের ফিকির ও মানহাজও যেন সুন্নত অনুযায়ী হয়। কর্ম ও দাওয়াতের পদ্ধতিও যেন সুন্নত অনুযায়ী হয়। যেই হকের দাওয়াত দিচ্ছে তার কাজের মধ্যে তার নমুনা যেন পাওয়া যায়। আর তার দাওয়াতের মধ্যেও যেন সর্বদা তার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। ফিকির ও আমলের মানহায এবং কর্ম ও দাওয়াতের পদ্ধতি যদি হক ও এক হয় তখন দাওয়াতে সফলতা আসবে ইনশা আল্লাহ।

জিহাদের দাঈ কখন নিরাপদ থাকে

জিহাদের দাঈ যেই বিপদ ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকে, খুব কম মানুষই এমন বিপদের মধ্যে থাকে। মাধ্যম, অস্ত্র, সংখ্যা সবদিক থেকেই নিজের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়। অনেকসময় যাদেরকে শত্রুর মোকাবেলায় নিজের সাথে রাখতে চায় তারাই বিরোধিতা শুরু করে, তখন খুব ধৈর্য ও হেকমতের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া জিহাদের সফরে পদে পদে এমনসব বিষয় উপস্থিত হয়, যেখানে সামান্য ভুলও বড় ধরণের বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়। অনেকসময় জযবা হুশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। এধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহর দয়া না থাকলে দাঈ ও মুজাহিদ সঠিক রাস্তা থেকে সরে যেতে পারে, এবং নিজেই জিহাদের দাওয়াতের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। এই ক্ষতি থেকে দাঈ তখন বাঁচতে পারে যখন তার ফিকির ও মানহাজ সুন্নত অনুযায়ী হবে। তার কাজ-কর্ম ও দাওয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহিনের মত হবে। আর এটা তো তখন হবে যখন সে সুন্নতের অনুসরণের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে, এবং এই ভয় করবে যে, আল্লাহ না করুন আমার কোন ত্রুটির কারণে আমার থেকে হেদায়াত ছিনিয়ে না নেয়া হয়।

এই নেয়ামতকে সিনার সাথে লাগানোর মাধ্যম হলো উলামায়ে কেরামের অনুসরণ ও নেককারদের সোহবত। দ্বীনের দা’ঈর ফিকির ও মানহাজ তখনই হেফাজতে থাকবে যখন এমন উলমায়ে কেরাম থেকে নিজের দ্বীনকে গ্রহণ করবে যাদের তাকওয়া-আখলাক, ইলম-ইনসাফ, ফিকহ-বুঝ, অভিজ্ঞতা ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন হওয়া অন্যান্য উলমায়ে কেরামের নিকট স্বীকৃত। তারা স্বজনপ্রীতি, প্রতিশোধ,

রাগ বা নফসের চাহিদা অনুযায়ী ফতোয়া দেবে না, বরং কথা ও কাজে আল্লাহর ভয় প্রকাশ পাবে। তারা শরয়ী নীতিমালার উপর পারদর্শী হবে। আর এইসব গুণ ওই সকল আলেমদের মাঝেই পাওয়া যাবে, যারা জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের ইজতেহাদ অনুযায়ী ফতোয়া দেয় না। বরং এক্ষেত্রে নিজের থেকে ভালো অগ্রগামী আলেমদের অনুসরণ করে এবং সমসাময়িক আলেমদের সাথে পরামর্শ করে।

এমন উলামায়ে কেরাম আজও বিদ্যমান আছে। যদি জিহাদের দাঈ নিজের ফিকির, কাজ-কর্ম ও দাওয়াতের পদ্ধতিতে এই উলামায়ে কেরামের অনুসরণ করে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাকে গোমরাহ করবেন না। এবং সে দ্বীন ও জিহাদের খেদমতও করতে পারবে। এখানে একথাটিও বলে দিই - ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিগত তিন দশকের সফলতা ও জিহাদী অভিজ্ঞতা হোক, অথবা খোরাসান থেকে ইয়েমেন, মালি বা শাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া বৈশ্বিক জিহাদী অভিজ্ঞতা হোক, এই সকল অভিজ্ঞতা উম্মতকে খুব দামি একটি সবক দিয়েছে। সেটি হচ্ছে হক উলামায়ে কেরামের অনুসরণেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। উম্মতের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে - এমনকি গুরুত্বপূর্ণ জিহাদি বিষয় সম্ভবত একটিও এমন নেই, যে বিষয়ে জিহাদি নেতারা বিচক্ষণতার সাথে সমাধান দেননি। সুতরাং আমরা যদি এই উলামেয়ে কেরাম ও জিহাদের নেতাদের দরসগুলো থেকে সবক নিতে থাকি তাহলে এই সফর খুব ভালোভাবে হেফাযত থাকবে এবং বারবার ধাক্কা খাওয়া লাগবে না ইনশাআল্লাহ।

দাওয়াতের তরীকার মধ্যে বাড়াবাড়ি কেন সৃষ্টি হয়?

প্রথম কারণ - শ্রোতাদের থেকে অমুখাপেক্ষী ও বেপরোয়া হওয়া

দাওয়াতের পদ্ধতিতে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা নানান কারণে সৃষ্টি হতে পারে। তবে মূল কারণ হলো - দাঈর ফিকির, আমল-আখলাক সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া। ভিতরগত আরেকটি কারণ হলো – শ্রোতার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা ও তার ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া।

কেউ যদি দুনিয়াবি বিষয়ে আল্লাহর জন্য মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষীতা অবলম্বন করে তাহলে সেটা তো একটি ভালো গুণ। কিন্তু এর স্থান দাওয়াতের ময়দান নয়। দাওয়াতের ময়দানে শ্রোতাদের থেকে অমুখাপেক্ষীতা কাম্য নয়। কাম্য হলো উম্মাহর জন্য কল্যাণকামীতা ও দরদ থাকা। দাঈর দুনিয়া আখেরাতের সফলতার জন্য শর্ত হলো, সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করবে।

একজন দাঈ খুব করে চান মানুষ যেন তার আহবানে সাড়া দেয়। এজন্য সে তার দাওয়াতকে খুব ভালো আর উপকারী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে থাকে। তার উদাহরণ হল ওই ডাক্তারের মত, যে আন্তরিকভাবে রোগীর চিকিৎসা করে। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করে, তার জন্য ব্যথিত হয়। রোগীর একেকবার 'আহ' উচ্চারণের সাথে সাথে তার অন্তর চূর্ণ- বিচূর্ণ হয়ে যায়। শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত রোগীকে বাঁচানোর চিন্তায় অস্থির থাকে। যে সকল ডাক্তার শুধু রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ঘোষণা করেই চলে যায়, সে ওই ডাক্তারের মত না। রোগীর সাথে দাঈর একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

'গুলু' আক্রান্ত ব্যক্তি তার দাওয়াত কেউ কবুল করল কি করল না – এই বিষয়ে কোন পরওয়া করে না। সে সর্বাবস্থায় নিজেকে হক মনে করে। নিজেকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ভেবে নিয়ত ও অন্তরের অবস্থার হিসাব নেয় না। দাওয়াতের হক আদায় হলো কি না এই নিয়ে ভাবে না। দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিজের কথা ও কাজের মধ্যে কোন ত্রুটি হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে ভাবে না। "কোন কাজে সুন্নতের খেলাফ হয়নি তো? "দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূর্খতাকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে নেই নি তো?" " আমার প্রকাশভঙ্গিতে বাড়াবাড়ি হয়নি তো?" – এই ধরণের ফিকির গুলুতে আক্রান্ত ব্যক্তিতে অনুপস্থিত। সে নিজের হিসাব নেয় না।

এসকল হিসাব-নিকাশে তার কোন খেয়ালই নেই। নিজেকে সে বড় মনে করে। "সত্যকে প্রকাশ করতে হবে"এমন একটা ভাব তার মধ্যে। অথচ এটা এমন এক অনুভূতি, যা পরবর্তীতে আত্মম্ভরিতা ও অহংকারে পরিণত হয়।

গুলুতে আক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত রসকষহীনভাবে নিজের দাওয়াতের ঘোষণা দেয়। কুরআন সুন্নাহতে দাঈর যে গুণাবলী আছে সে তার পরিপূর্ণ উল্টা। নবীগণের এক এক জন মানুষকে বাঁচানোর চিন্তা থাকতো। এই উদ্দেশ্যে তারা দিন-রাত এক করে ফেলতেন। মানুষকে হেদায়াতের পথে আনার জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট তারাই

করেছেন। রাতে উঠে আল্লাহর কাছে মানুষের হেদায়াত চাইতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চিন্তায় এত বেশি কষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

অর্থঃ তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পিছনে ঘুরে তুমি দুঃখে নিজেকে শেষ করে দিবে। [সুরা কাহাফ ১৮;৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরদটা দেখুন। সম্মুখ যুদ্ধের ময়দান। ইহুদিদের মত শত্রুর বিরুদ্ধে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তলোয়ার দিয়ে পাঠাচ্ছেন। তখনও তাকে নছিহত করছেন, "তোমার হাতে একজন মানুষের হেদায়াত পাওয়া তোমার জন্য লাল উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম"।

দ্বিতীয় কারণ - বুঝ কম থাকা

দাওয়াতের উসলুবে গুলু আসার দ্বিতীয় কারণ হলো - বুঝ কম থাকা। আল্লাহ তাআলার শরয়ী তাকবীনী উসুল সম্পর্কে যার ধারণা আছে - সে জানে যে, জিহাদের ময়দানে কামিয়াবির জন্য আল্লাহর পরে নিজেকে মুসলমান জনসাধারণের সাহায্য-সমর্থনের মুখাপেক্ষী মনে করতে হবে। সে জানে মুমিনের সমর্থন আল্লাহর নুসরতের একটি সুরত।

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

"তিনিই আপনাকে তার সাহায্য ও মুমিনদের একতা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। [সুরা আল-আনফাল ৮;৬২]

এই কারণেই দাওয়াতের শুরুতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেলার মধ্যে আরব গোত্রগুলোকে দাওয়াত পেশ করতেন। তখন একথাও বলতেন, "আমাকে কে আশ্রয় দেবে? আমাকে কে সাহায্য করবে?"

তো মুসলমান জনসাধারণকে নিজেদের সমর্থনকারী, সাহায্যকারী বানানো শরয়ী ও আকলী তাকাযা। শরয়ী সীমারেখার মধ্যে থেকে মুসলমান জনসাধারণকে নিজেদের

জিহাদের অংশ বানানোর চেষ্টা করা ওয়াজিব। কিন্তু জিহাদের প্রতি দাওয়াত প্রদানকারীদের কম বুঝের অবস্থাটা দেখুন -

তারা কয়েক ডজন বা কয়েকশ মানুষ নিজেরাই দুনিয়ার সব মুসলমানকে নিজেদের বিরোধী বানিয়ে নেয়। তারপর আবার পুরো দুনিয়ায় বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তারা কুফুরী নেজাম বিলুপ্তি ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার মত বড় দাবি করে, কিন্তু জনসাধারণ ও দ্বীনদার লোকদেরকে নিজেদের সাথে শরীক করার কোন চেষ্টাই তাদের মাঝে নেই। মুসলমান জনসাধারণকে নিজেদের সমর্থনকারী, সাহায্যকারী বানানো ছাড়া কুফুরী শাসনব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা তো দূরে থাক, নিজেদের আন্দোলনকেই বেশিদিন চালু রাখা সম্ভব না এই বুঝটা তাদের মাঝে আসে না।

শায়খ আবু মুসআব যারকাবী রহিমাহুল্লাহ আমেরিকাকে ইরাকে থাকা প্রায় অসম্ভব বানিয়ে দিয়েছিলেন। শেষমেশ আমেরিকা ইরাক থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেসময় শায়খ আইমান যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ, আবু মুসআব যারকাবী রহিমাহুল্লাহ কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিতে শায়খ আইমান দা. বা. বলেন:

"যখন আমরা দুই টার্গেটের দিকে তাকাবো, অর্থাৎ আমেরিকাকে ইরাক থেকে বের করা ও এখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা - তখন আমরা দেখতে পাব, আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিকের পরে মুজাহিদদের জন্য সব থেকে প্রভাব বিস্তারকারী ও শক্তিশালী অস্ত্র হলো ইরাক এবং তার আশেপাশের মুসলমান জনসাধারণের সমর্থন। আমাদের জন্য জরুরী হলো - এই জনসমর্থন রক্ষা করা এবং শরয়ী সীমারেখার মধ্যে থেকে এই সমর্থনকে বাড়ানো।

এ প্রেক্ষিতে আমি আপনাকে কয়েকটি কথা আরজ করছি -

প্রথমত; এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে (ইরাকে) ইসলামের বিজয় এবং খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ছাড়া তাদেরকে হটানো সম্ভব নয়। এটাও বাস্তবতা যে, জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া এই মহান লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। যদি কোথাও জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া বিজয় হয়েও যায়, তবুও যেকোন সময় এই বিজয় পরাজয়ে পরিণত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যদি জিহাদি আন্দোলনের সাথে জনগণের সমর্থন না থাকে তাহলে এই আন্দোলন মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে একসময় হারিয়ে যায়। এই অবস্থায় জিহাদি গ্রুপ ও রাষ্ট্রের উপর চেপে বসা জালিম সম্প্রদায়ের মধ্যকার এই যুদ্ধ নিঃশেষ হয়ে যায়।

একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে – ক্ষমতাশীলরা সবসময় জনগণকে জিহাদি দল ও জিহাদি আন্দোলনের ব্যাপারে একদম অন্ধকারে রাখতে চায়। আমাদের উপর চেপে বসা সেকুলাররা এটাই চায়। তারা জানে জিহাদি আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ আন্দোলনকে ধোঁকা ও শক্তির মাধ্যমে জনসমর্থন থেকে দূরে রাখা সম্ভব। এজন্য এই যুদ্ধে আমাদের জন্য জরুরী হলো - আমরা জনগণকে আমাদের সাথে রাখব। জিহাদি আন্দোলনের নেতৃত্বেও তাদেরকে অংশীদার বানাব। আমাদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে যা আমাদেরকে জনসাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।”

শায়খ যাওয়াহিরী অন্য এক জায়গায় বলেন:

“গেরিলা হামলাকারী মুজাহিদদের যদি পিছিয়ে আসতে হয় তাহলে তার কারণে পেরেশান হওয়া উচিৎ নয়। কারণ তাদের যুদ্ধ জনগণকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করার যুদ্ধ, জমিন দখলের যুদ্ধ নয়।”

তৃতীয় কারণ - মুদারাত(সৌজন্য) ও মুদাহানাতের (খোশামোদ, চাটুকারিতা) মাঝে পার্থক্য না করা

দাওয়াতের মাঝে গুলুর আরেকটি কারণ হলো মুদারাত ও মুদাহানাতকে এক মনে করা। অথচ উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। একটি জায়েজ এবং প্রশংসনীয়, অন্যটি নিন্দনীয়। ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ মুদারাত ও মুদাহানাতের মাঝে পার্থক্য এভাবে বর্ণনা করেছেন: “মুদারাত হলো দুনিয়া বা দ্বীন অথবা উভয়টির ফায়দার জন্য দুনিয়াবি বিষয় ত্যাগ করা। যা জায়েজ, অনেক সময় মুস্তাহাব কিন্তু মুদাহানাত হলো দুনিয়ার জন্য দ্বীনকে ত্যাগ করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

মানুষের সাথে সৌজন্য আচরণ ছদকা (তাবারানী)

শারেহ ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন: “সৌজন্য মুমিনের আখলাকের অংশ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামনে নিজের কাঁধকে ঝুঁকানো। কথাবার্তায় তাদের সাথে শক্ত ব্যবহার না করা। এই গুণ নিঃসন্দেহে ভালোবাসা মহব্বত সৃষ্টির একটি উত্তম মাধ্যম”

সুতরাং শ্রোতার বিরোধিতায় ধৈর্য ধারণ করা, দাওয়াতের জন্য নরম-কোমল ও উপকারী পদ্ধতিতে হকের দিকে আহবান করা এবং শ্রোতার ভ্রান্ত মতকে কোনভাবেই সঠিক না বলা - এটা মুদারাত, এটা প্রশংসনীয়। কিন্তু যদি এই নরম ব্যবহারের সাথে বাতিলকে হক বলা হয় - তখন সেটা মুদাহানাত, এটা নিষেধ। এজন্যে দাঈর মুদারাত-মুদাহানাতের সীমারেখা বুঝা উচিৎ। যাতে মুদারাতের নাম দিয়ে মুদাহানাতে লিপ্ত না হয়। অথবা মুদাহানাতের বিরোধিতা করতে গিয়ে মুদারাতও পরিত্যাগ না করে।

আফসোস! আজ কিছু দ্বীনদার শ্রেণী দাওয়াতে বিচক্ষণতার নাম দিয়ে গণতন্ত্র, স্বদেশপ্রেম, সেক্যুলারিজ্যমকে পর্যন্ত সমর্থন করে। অথচ কুফুরি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধিতা কাম্য। কিন্তু এই হযরতরা তাদের সাথে সমঝোতা ও সহযোগিতামূলক আচরণ করে। আর যদি কেউ ফরজ ডাকে ‘লাব্বাইক’ বলে বাতিল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাড়িয়ে যায় এবং এই নিকৃষ্ট পথে বাঁধা হয়ে দাড়ায়, তখন তারা তাকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করে। এই গণতন্ত্র ও অন্যান্য মানুষ নির্মিত মতবাদে অংশগ্রহণ ও সমর্থন - শরীয়তের খেলাফ কাজ।

কিন্তু আশ্চর্য!এই অনৈসলামিক কাজও দীনী মাছলাহাত নাম দিয়ে ইসলামী কাজ প্রমাণিত করা হচ্ছে। এটা স্পষ্ট মুদাহানাত। এটাই ওই মহা বিপদ যার কারণে আজ আল্লাহর শরিয়ত পরাজিত, আর গাইরুল্লাহর আইন বিজয়ী।

সুতরাং এই মুদাহানাতের পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং তার বিরোধিতা করা অত্যন্ত জরুরী। আর মুজাহিদদেরও উচিৎ সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা যাতে তাদের মধ্যে কোনভাবে এই মহামারী প্রবেশ না করে। আরেকদিকে এই মুদাহানাতের বিরোধিতা করতে করতে আমাদের কোন কোন গ্রুপ মুদারাতকেও মুদাহানাত মনে করা শুরু করছে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হল বাতিলকে সরাসরি বাতিল বলা এবং হককে হক বলা। তারপর হকের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং পুরো দাওয়াতি আমল শরীয়ত

অনুযায়ী করা। এই দাওয়াত নরম ও কোমল পদ্ধতিতে হেকমত অনুযায়ী হয়। মানসিকতার ভিন্নতার কারণে এই ধরণের দাওয়াত কারও কারও কাছে মুদাহানাত মনে হয়। তার কাছে এই দাওয়াত গ্রহণযোগ্য নয়। তার মানসিক শান্তি তখনই হয়, যখন দাওয়াতের প্রাণ ও ভাষা উভয় দিক থেকে খুব শক্ত হয়। যে দাওয়াতের মধ্যে শ্রোতার প্রতি কোন কল্যাণকামিতা বা দরদ ব্যথা থাকে না বরং হিংসা, ঘৃণা, শত্রুতা ও খাটো করা হয় সেটা তার কাছে দাওয়াতের উত্তম পদ্ধতি মনে হয়। ভিন্ন এই মানসিকতার কারণে এই সমস্ত কাজকে সে হকের তাকাযা মনে করে। অথচ এটা গুলু বা বাড়াবাড়ি । এর কারণে দাওয়াতের উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। এবং জিহাদের উল্টা ক্ষতি হয়।

চতুর্থ কারণ - তাড়াহুড়া এবং দাওয়াতের ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞতা

দাওয়াতের তরীকার মধ্যে কঠোরতার বড় একটি কারণ হলো তাড়াহুড়া প্রবণতা। অনেক সময় ভালো ভালো মানুষও এর শিকার হয়ে যায়। যখন সে দেখে যে, দ্বীনদার শ্রেণী; বিশেষ করে উলামায়ে কেরাম, এবং দ্বীনী রাজনৈতিক দলগুলো তার সাথে নেই, তারা নীরব ভূমিকা পালন করে অথবা তার সাথে কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে, তখন তার ধৈর্য ছুটে যায়। এর ফলে দাওয়াতে কঠোরতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

আমাদের সামনে যদি আমরা দাওয়াতের ওইতিহাসিক বাস্তবতা রাখি, তাহলে এই কঠোরতা করবো না। বাস্তবতাটা হলো - যখনই এমন কোন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে যার দ্বারা পূর্বের শাসনব্যবস্থা উল্টে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে - সে দাওয়াতে মানুষের অংশগ্রহণ সহজ নয়। বর্তমানে আমাদের দাওয়াত কবুল করা শাসনব্যবস্থার সাথে লড়াই করা সমস্ত বিপদকে ডেকে আনার মতো ।

এজন্য এই ধরণের দাওয়াতের ফলে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়।

১. সত্যসন্ধানী, সুউচ্চ মনোবলসম্পন্ন মানুষই এই দাওয়াতে ‘লাব্বাইক’ বলে। এরা নিজেই নিজের উপর মুসিবতের পাহাড় বহন করার জন্য সামনে অগ্রসর হয়। এই শ্রেণী সর্বদা স্বল্পসংখ্যক হয়।

২. দ্বিতীয় শ্রেণী তারা যারা নেতৃত্বের আসনে থাকে অথবা যারা প্রচলিত ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এই শ্রেণী এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে ও এটাকে নির্মূল করার জন্য মাঠে নেমে আসে।

৩. তৃতীয় শ্রেণী, যারা স্বাভাবিক জীবনযাপনে নিমজ্জিত। এদের অনেকেই হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার ইচ্ছা রাখে এবং হকের সাথে থাকতে আগ্রহী। কিন্তু তাদের ক্ষমতাসীনদের ভয় প্রবল। এজন্য অনেক লাভকে ছেড়ে দেয়া এবং বহু ক্ষতি গ্রহণ করতে তাদের মন তৈরি হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন শক্তিশালী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করার জযবা তৈরি হয় না। সে অবস্থা পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকে। যখন এই আন্দোলন শক্তিশালী হওয়া শুরু করে তখন এই শ্রেণী দলে দলে সাহায্য করা ও সমর্থন দেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়।

এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ও তার দাওয়াতি কাফেলার ইতিহাস। যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কার মুশরিকদের শক্তি খর্ব না হয়েছে ততদিন মুসলমানের সংখ্যা কম ছিলো। এরপর যখন মক্কা বিজয় হলো (সুরা নাসরের প্রথম আয়াত) তখন দলে দলে মানুষ মুসলমান হওয়া শুরু হলো(দ্বিতীয় আয়াত)।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

অর্থ: যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় (১) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (২) [সূরা আন-নাসর ১১০;১-২]

সুতরাং সংখ্যাধিক্য, সেটা সাধারণ মানুষের হোক বা দ্বীনদার শ্রেণির হোক, তাদের নীরব অবস্থান বা কিছু বিরোধিতা দেখে জিহাদের দাঈ ধৈর্যহীন হবে না। এটা কখনই হয়নি যে, জিহাদি আন্দোলন কঠিন স্তর পার করছে আর সমাজের অধিকাংশ মানুষ তাদের সাথে আছে। সুতরাং আমাদের এই সংখ্যাধিক্যের সাথে (**خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ**) "ক্ষমাকে গ্রহণ করুন সৎ কাজের নির্দেশ দান করুন এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলুন" এর উপর আমল করতে হবে।

(খুযিল আফওয়া) অর্থাৎ যতটুকু সাহায্য ও কল্যাণকামিতা তারা আপনার সাথে করতে পারে কৃতজ্ঞতার সাথে তা গ্রহণ করুন। (ওঅমুর বিল উরফ) অর্থাৎ

দরদের সাথে দাওয়াত, ইসলাহ, উৎসাহদান ও দিকনির্দেশনার কাজ চালু রাখুন। দলিল প্রমাণের মাধ্যমে তাদের বুদ্ধিকে কাবু করুন। তাদের মধ্য থেকে যারা (জবান ও কলম দ্বারা) মূর্খতা প্রকাশ করে তাদেরকে এড়িয়ে যান। আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, অস্ত্র যেন কুফুরী শাসনব্যবস্থা নির্মূল করায় ব্যয় হয়। অন্য কাজে যেন সময় নষ্ট না হয়।

জিহাদি আন্দোলনের রাস্তায় আসল বাঁধা

আমরা এটা মানছি যে, দ্বীনদার নেতাদের এক শ্রেণী খুব দুনিয়াদার। এটাও মানছি যে, সমষ্টিগতভাবে এই দ্বীনী রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ সঠিক নয়। তাদেরই কারণে কুফুরী শাসনব্যবস্থা শক্তি পাচ্ছে। তাগুতি শাসনব্যবস্থা তাদেরকে ইসলামের বিপক্ষে ব্যবহার করছে। এবিষয়ে সবাই একমত। রোগ নির্ণয়ে মতবিরোধ নেই, প্রশ্ন হলো চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে।

যদি আপনি এই সেক্যুলার, দ্বীনের দুশমন শ্রেণী, জালিম রাষ্ট্রের অস্ত্রধারী রক্ষীবাহিনীকে ছেড়ে - এই দ্বীনদারদের হিসাবনিকাশ শুরু করেন, তাদের বিরুদ্ধে কুফুরির ফতোয়া খুঁজতে থাকেন - তাহলে এটা চিকিৎসা নয়, বরং রোগবৃদ্ধি। এই শ্রেণী বর্তমান সময়ে জিহাদি আন্দোলনের পথে আসল বাঁধা নয়। এরা নিঃশেষ হয়ে গেলেও আপনার কাজ শেষ হবে না।

এখানে আসল বাঁধা হলো – ওই সকল ধর্মহীন নেতারা যারা অস্ত্র, জুলুম ও নিজেদের ভাড়া করা খুনিদের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করছে। এরাই বন্দুক উঁচিয়ে সাধারণ মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। কুফর নেফাকের চিহ্নধারী শাসকশ্রেণী, টাকা পয়সার গোলাম জেনারেলরা এবং মুসলমানদের হত্যাকারী এই ভাড়াটে খুনিরা - এমন এক ক্ষত, যাদের অস্তিত্বের কারণেই - সমস্ত ফাসাদের মূল এই কুফুরী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। এরাই ওই ধোঁকাবাজ শ্রেণী যারা এসমস্ত দ্বীনদারদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে। এই দ্বীনের শত্রুরা চায় আমরা দ্বীনদার শ্রেণীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকি, তাতে তারা বেঁচে যায়। এরপর তারা দ্বীনদারদের মাঝে অনৈক্য দেখিয়ে দ্বীনকেই দোষারোপ করে। তারা প্রোপাগান্ডা ছড়ায় - ধর্মই যত সমস্যার মূল, এজন্যই দ্বীনদাররা ঝগড়ায় লিপ্ত। অর্থাৎ এক তীরে দুই শিকার হয়ে যায়।

এমন অবস্থা হলে তো আমাদের দাওয়াত বদ-দ্বীন নয়, দ্বীনদারদের হাতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা যতই এই দ্বীনদারদের বিরুদ্ধে ফতোয়া লিখবো - তাদের বিরুদ্ধে ঝগড়ার ময়দান গরম করবো - ততই আমাদের দাওয়াত অস্পষ্ট হতে থাকবে এবং আমরা লক্ষ্য থেকে দূরে সরতে থাকবো। এরপর আমাদের আন্দোলন খুব দ্রুত একাকীত্বের শিকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তাই আমরা এই দ্বীনদারদের সাথে ফতোয়ার ভাষায় কথা বলব না, দাওয়াতের ভাষায় কথা বলবো। হুমকি-ধমকি, অপদস্থকরণ, গালি-গালাজ নয়, বরং দলিল-প্রমাণ, দরদ-ব্যথার সাথে দাওয়াত দেয়া শিখে নিব। আর এর শরয়ী আহকামও জেনে নেয়া জরুরী, যাতে নিজেদের থেকে ইতেদাল না ছুটে না যায়।

আইএস থেকেও নিকৃষ্ট চিন্তা: জিহাদের দাঈর করণীয়

দ্বীনী রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ দ্বীনদার। তাদের সাথে কয়েক বিষয়ে আমাদের ঐক্য রয়েছে। আর কয়েক বিষয়ে মতবিরোধ আছে। তাদের মধ্যে ভালোও আছে খারাপও আছে। সেক্যুলার দলগুলোর তুলনায় তারা আমাদের মিত্র। প্রতিপক্ষ নয়। ধর্মহীনদের তুলনায় তাদের ও আমাদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। আর দাঈর তো চাহিদাই থাকে মিল থাকা বিষয়কে তালাশ করা। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে বাতিল বিষয়কে বাতিল প্রমাণ করা। তারপর যোগ্যতা ও আখলাকের বিচারেও এই দ্বীনদাররা সবাই এক কাতারে নয়।

আমি আবারও বলছি, প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কথা হচ্ছে না। এটা তো কুফুরী। এই ব্যবস্থায় শরয়ী তাবিলের ভিত্তিতে ইসলামের নামে যারা এতে অংশগ্রহণ করে তাদের কথা বলছি। এরা কি কাফের? নাউজুবিল্লাহ! কখনও নয়। তাদের শরয়ী হুকুম উলামায়ে জিহাদ বর্ণনা করেছেন। এই দ্বীনদার শ্রেণীকে কাফের বলা, সাধারণ মানুষকে ভোটের কারণে কাফের বলা অথবা হিলা-বাহানার দ্বারা মুসলমানের জান-মালকে জায়েজ বানানো বড় ধরনের বাড়াবাড়ি। আর এটা ওই তাকফিরী চিন্তা, যা আলজেরিয়া থেকে শাম, ইরাক পর্যন্ত জিহাদি দাওয়াতকে ধ্বংস করেছে। এই চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যারা মুখে সাধারণ মুসলমানদেরকে বা অন্যান্য দ্বীনদারকে কাফের বলত না। তাদের কাছে

যদি জানতে চাওয়া হয়, তাহলে সাধারণ মুসলমানদেরকে মুসলমানই বলত। কিন্তু তাদের কাজ ছিলো পুরোপুরি এই দাবির বিপরীত।

তারা এমন দলান্ধ ছিলো, তাদের দলের বাহিরের সাধারণ মুসলমান তো পরের কথা দ্বীনদার, মুজাহিদদের সাথে পর্যন্ত কাফের বা কমপক্ষে বিদ্রোহী মানুষের মত আচরণ করত। তাদের জীবন, সম্পদ, সম্মানকে খুব হালকা করে দেখত। নিজেদের বানানো তাবীল দ্বারা তাদের জান মাল নিজেদের জন্য বৈধ করে নিত। কেন? কারণ কি ছিল?

কারণ শুধুমাত্র নিজের দলে না থাকা। অমুক লোক মুসলমান, দ্বীনদার, মুজাহিদও। শরীয়ত তার জান মাল ইজ্জতকে সংরক্ষিত বলে। কিন্তু এই লোকেরা শুধুমাত্র এই কারণে তাকে সহ্য করে না যে - সে তাদের দলে নেই কেন? কেন সে আমার গ্রুপকে শক্তিশালী করে না?

এই চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিরা সর্বদাই দাওয়াত ও জিহাদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ আছে যারা নিজেদেরকে আইএস বলে না, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সাথে মিশে থাকে। শুধুমাত্র মিশে থাকার দ্বারা কি হয়?

এই চিন্তা চেতনা 'আহলুস সুন্নাহ'র না। এই চেতনাই জিহাদের অনেক বদনাম করেছে। বাস্তবতা হলো আইএস হওয়া কোন বিশেষ দলের সদস্য হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত না। এটা চিন্তা-চেতনা, আমল, আখলাক, কীর্তির নাম। যদি কোন ব্যক্তি দলগতভাবে আইএস নাও হয়, কিন্তু তার চিন্তা চেতনায় গুলু থাকে – আহলুস সুন্নাহ ও বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ জিহাদি আলেমদের থেকে তার মানহাজ ভিন্ন হয় - নফসের পূজা, দলান্ধতা এবং নফসের অনুসরণে লিপ্ত হয় এবং হিলা বাহানায় মুসলমানের জান-মাল বৈধ করে নেয়, তাহলে সে যতই আই-এসের বিরোধিতা করুক না কেন, সে প্রথম স্তরের আইএস। বরং বাস্তবতা হলো এসমস্ত লোক জিহাদি আন্দোলনের জন্য আইএস থেকেও ভয়ঙ্কর।

কারণ আই-এসের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আইএস শব্দটি ফাসাদকারী অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর তারা এখন নিঃশেষের পথে। অথচ এই লোক নিজেকে আই-এসের বিরোধী বলেও কথা ও কাজ দ্বারা দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষতি করছে। সুতরাং আইএস যেভাবে জিহাদের ক্ষতি করেছে, তেমনি গুলুর শিকার চিন্তা-চেতনাও জিহাদের দুশমনদের কম খেদমত করেনি।

সুতরাং জিহাদি আন্দোলনকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার জন্য গুলুর শিকার এই চিন্তা-চেতনা, আখলাক ও মানহাজকে জানতে হবে। এটি একটি অকল্যাণ, আর কল্যাণের উপর আমল করার জন্য অকল্যাণের জ্ঞান থাকা ওয়াজিব। সুতরাং এই মানহাজকে চেনা, তার থেকে দূরে থাকা, মুসলিম যুবকদের এর থেকে দূরে রাখা জিহাদের দাঈ ও মুজাহিদদের জন্য ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কোন বিষয়ে আমল করার জন্য সে বিষয়ে ইলম অর্জন করা ওয়াজিব, নতুবা আল্লাহ না করুন আমাদের মধ্য থেকে কেউ ওই দলে চলে যেতে পারে; যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

لْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

অর্থ: . . . বলে দেন আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কারা আমলের দিক থেকে একদম ক্ষতিগ্রস্ত। যাদের কাজ দুনিয়াতে নষ্ট হয়ে গেছে আর তারা ধারণা করে তারা ভালো কাজ করছে। [সূরা কাহাফ ৯; ১০৩-১০৪]

তাকফীর ও তুচ্ছ করা ছাড়াও সমালোচনা ও সংশোধন সম্ভব

মাসআলা হলো; এই কুফুরী শাসনব্যবস্থায় শরয়ী তাবীলের মাধ্যমে, দ্বীনের খেদমতের নামে কেউ যদি অংশ গ্রহণ করে তাহলে জিহাদের আলেমদের মতে এটি বাড়াবাড়ি, গুনাহের কাজ এবং হারাম। তার পুরোপুরি বিরোধিতা করা হবে, এবং দাওয়াতের ভাষায় এই ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হবে। কিন্তু তাদেরকে কাফের বলা হবে না। এই ব্যক্তিরা সবাই এক স্তরের নয়। কোন বিশেষ নেতা এমনও থাকতে পারে, যে দ্বীন ও জিহাদের ক্ষতি করায় অনেক অগ্রসর অথবা তার ব্যক্তিগত কোন কাজ তার ঈমানের দাবির বিপরীত - কিন্তু তা সত্বেও ওই ব্যক্তিকে কাফের ফতোয়া দেয়া থেকে আমাদের ভাষাকে সংযত করবো। তার বিরুদ্ধে এই ধরণের ফতোয়া দেয়া জিহাদের দাওয়াতের জন্য ক্ষতির কারণ।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পূর্ববর্তী আলেমগণ সর্বদা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গ্রুপকে কাফের ফতোয়া দেয়ার পূর্বে দাওয়াতের লাভ-ক্ষতির দিকটি

বিবেচনায় রাখতেন। যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের পোশাক গায়ে জড়াতো অর্থাৎ মুসলিম দাবী করত অথচ সে কুফুরী গ্রহণ করেছে - তাহলে পূর্ববর্তী আলেমগণ দেখতেন তাকে স্পষ্ট কাফের ফতোয়া দেয়া বা হত্যা করা দ্বারা দাওয়াতের ক্ষতি হবে নাকি লাভ হবে। যদি ক্ষতি হওয়ার আশংকা বেশি থাকত তাহলে নাম ধরা ছাড়া তার সমালোচনা হত। সংশোধনের চেষ্টা করা হত। তার খারাবী বন্ধ করে দেয়া হত। কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট করে তাকফিরও করা হত না। তাকে হত্যা করাও হত না।

রঈসুল মুনাফেকীন আব্দুল্লাহ বিন উবাই'র সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের দিকে লক্ষ করি। সাহাবীগণ যখন বললেন, "আমরা তাকে হত্যা করি?" তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাকে ছাড়, মানুষ বলবে মুহাম্মদ তার সাথীদের হত্যা করে"।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করি - ইবনে উবাই আনসারিদের খাজরাজ গোত্রের ছিল। এক গোত্র হওয়ার কারণে খাজরাজের সরদার হযরত সাআদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবী হওয়া সত্বেও এটা সহ্য করেননি যে, অন্য গোত্রের কোন লোক তাকে (ইবনে উবাইকে) হত্যা করবে। এই কারণেই আউস গোত্রের সরদার হযরত সাআদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, তখন সাআদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উপর রাগ করলেন এবং এমন কাজ করতে নিষেধ করলেন।

এই ঘটনা মুসলিম শরিফের মধ্যে এসেছে। সেখানে আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর একটি কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "সাআদ বিন উবাদা ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু ওই সময় তার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠেছিল। তিনি চাচ্ছিলেন যদি হত্যা করার আদেশ দেয়া হয় তাহলে যেন তাদেরকে আল্লাহর রাসুল আদেশ দেন। তারাই ইবনে উবাইকে হত্যা করবে। অন্য গোত্রের কেউ হত্যা করবে এটা তারা চাচ্ছিলেন না। ঠিক এমন কথাই বলেছিলেন ইবনে উবাই এর মুসলমান ছেলে 'আব্দুল্লাহ' রাদিয়াল্লাহু আনহু ।

যখন ইবনে উবাই এর খারাবী বেড়ে গেলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের বিষয়টি তিনি বুঝতে পারলেন, তখন তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আমার পিতাকে হত্যা করতে চান তাহলে আমাকে আদেশ করুন। আমিই তার মাথা এনে আপনার সামনের রাখব। কিন্তু অন্য কেউ হত্যা করলে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগবে”।

সম্মানিত ভাইয়েরা!

বংশীয় এবং দলীয় সম্পর্ক খুব নাযুক। নিজের দলের কোন নেতার সাথে দলের কোন সদস্যের মতবিরোধ থাকতে পারে - কোন এক পর্যায়ে সে তাকে খারাবও মনে করতে পারে। কিন্তু দলের বাহিরের কেউ ওই নেতার নামে কোন খারাপ কথা বললে তার দলীয় অনুভূতি জেগে উঠে। বিশেষ করে দলটি যখন দ্বীনী দল হয় তখন অনুভূতিও তীব্র হয়। তাই এই নাজুকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

এই দ্বীনী দলের মধ্যে ভালো মানুষও আছে। তারা তাদের নেতাদের ভালোবাসে নেতাদের দুনিয়া পূজার কারণে নয়, বরং নেতাদের দ্বীনী খেদমতের কারণে বা দ্বীনী খেদমতের ওয়াদার কারণে। সুতরাং এই নেতাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে আমরা কীভাবে ধারণা করতে পারি যে, তার দলের লোকেরা আমাদের কথা শুনবে? আর তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেয়ার দারা অন্য দ্বীনদার ও জনসাধারণকে মোটেও প্রভাবিত করা যায় না।

সুতরাং আপনি যদি চান যে, তাদের এই রোগের চিকিৎসা করবেন, তাদেরকে গণতন্ত্রের কুফুরী বুঝাবেন, তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে নববী মানহাজে নিয়ে আসবেন, তাদেরকে এই খারাপ পথ থেকে ফিরাবেন, তাহলে সিরাতের অনুসরণ করুন। কাজের সমালোচনা করুন। কারো নাম উল্লেখ ব্যতীত, কাউকে কাফের ফতোয়া দেয়া ব্যতীত গণতন্ত্রের ভ্রান্ত হওয়ার দলিলাদি বর্ণনা করুন।

মানুষ তাদের কথা মানবে না আমাদের কথা মানবে?

লাল মসজিদ ট্রাজেডির পর যখন সব মুজাহিদরা দুঃখিত ও মনকষ্টে ছিলো, তখন আমাদের মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত কিছু ভাই পাকিস্তানের এক বড় মুফতি সাহেবের

ফটো নেতিবাচকভাবে প্রকাশ করেছিল। মুফতি সাহেবকে কাফের (নাউজুবিল্লাহ) ফতোয়া দেয়া হয়নি - ভদ্র ভাষায় কিছু সমালোচনা করা হয়েছিল ।

শায়খ আবু ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ কে আমি এই ভিডিওটি দেখালাম। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "এই ছবি কেন লাগিয়েছে"?

আমি বললাম, "মুফতি সাহেব লাল মসজিদের ব্যাপারে এই মতামত পেশ করেছেন। তাছাড়া তিনি এই করেছেন সেই করেছেন ইত্যাদি"।

তিনি বললেন: "আপনাদের এই কাজ সম্পূর্ণ ভুল"। তারপর তিনি বললেন: "এই মুফতি সাহেবের কত ভক্ত আছে? কত মানুষ তার জুমায় উপস্থিত হয়? স্পষ্টত লাখো মানুষ তাকে নিজেদের মুরুব্বি মনে করে। আর আপনার আমার কথা শোনার লোক কতজন? কতজন মানুষ আমাদের বলার দ্বারা এই মুফতি সাহেবকে খারাপ বলবে? আর কতজন মানুষ তার বলার দ্বারা আমাদেরকে খারাপ বলবে?

সাধারণ দ্বীনদার জনগণ আপনার তাকওয়া, জিহাদ, ইলম সম্পর্কে কিছুই জানে না। আপনি কে আপনার মর্যাদা কি তাও জানে না। কিন্তু আপনি যখন এমন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে খারাপ বলবেন যাকে তারা সম্মান করে, তাহলে শুধু আপনার বলার দ্বারা তারা তাকে কেন খারাপ বলা শুরু করবে? এরপর যদি ওই মুফতি সাহেব আপনাদেরকে খারেজী বলে তাহলে তারা কেন আপনাকে খারেজী বলবে না? লোকেরা আপনাদের মাধ্যমে তাদেরকে চেনে না, বরং তাদেরকে দিয়ে আপনাদেরকে চেনে। সুতরাং তারা আপনাদের ব্যাপারে যা বলবে লোকেরা তাই মেনে নেবে"।

তারপর শায়খ দ্বীনী রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন: "জনসাধারণের কাছে প্রসিদ্ধ এমন নেতাদের নাম উল্লেখ করে বা ছবি দিয়ে কোন সমালোচনা, দোষারোপ করা যাবে না। যদি কোন কারণে ছবি প্রকাশ করতেই হয়, তাহলে কোন প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ ছাড়াই - যত কম তিক্ত শব্দ ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। তারপর কথার ভঙ্গিতে কোন গোস্বা প্রকাশ না করা বরং কল্যাণকামিতা, সহানুভূতির প্রকাশ থাকা উচিৎ"।

তারপর আমি শায়খকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তাহলে গণতন্ত্রের কুফুরী এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির গোমরাহী কিভাবে বর্ণনা করবে? কিভাবে মানুষের কাছে এই গোমরাহী স্পষ্ট হবে”?

শায়খ বললেন: “গণতন্ত্র বিষয়টাকে স্পষ্টভাবে কুফর বলবে, ইসলামী গণতন্ত্র নামের পরিভাষাকে স্পষ্টভাবে বাতিল বলে ঘোষণা করবে। দলীল প্রমাণের মাধ্যমে এই চিন্তা-চেতনার অসারতা প্রমাণ করবে। বলবে - এই সিস্টেমে প্রবেশ করলে কুফুরী শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। এটা বাড়াবাড়ি, গুনাহের কাজ। কিন্তু এই সমালোচনায় নেতাদেরকে কাফের বলবে না। নেতাদের ছবি লাগিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা যাবে না। নিজেদেরকে ভালো এবং তাদেরকে খারাপ হিসেবে প্রকাশ করবে না। তাদের সাথে যদি কঠোর আচরণ, ঠাট্টামূলক কথাবার্তা বলা হয়, তাহলে তাদের অনুসারীরা স্বজনপ্রীতিতে পড়ে যাবে। আপনাদের কথায় কান দেবে না। এবং তাদের বিরোধিতা শত্রুতায় পরিণত হবে।”

জিহাদের দাঈ ভাইয়েরা!

এই সমস্ত দল ও ব্যক্তিবর্গের সাথে দলিল-প্রমাণের সাহায্যে ও দরদ-ব্যথা সহকারে মতবিরোধ হোক। তাদের প্রমাণাদি, কাজের পদ্ধতিরও খণ্ডন হোক। কিন্তু এই সমালোচনা তাকফিরের ভঙ্গিতে না হোক। বরং দরদের সাথে বুঝানোর জন্য হোক। তাছাড়া আরো একটি বিষয় হলো - যেই দ্বীনদাররা আমাদের বিরোধিতা করে, তাদের নিয়তের উপর আঘাত করবো না। শুধু তাদের কাজ ও আমলের সাথে মতবিরোধ করবো।

আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো - কোন ব্যক্তিকে যদি আপনি খারাপ মনে করেন, কিন্তু আপনার শ্রোতারা তাকে ভালো মনে করে এবং দ্বীনের খাদেম মনে করে - তাহলে আপনার খারাপ বলার দ্বারা, কাফের ফতোয়া দ্বারা আপনার কথা আপনার শ্রোতারা কখনও মানবে না। তাকে খারাপ না বলে তার খারাপ কাজকে খারাপ বলুন। দলিল-প্রমাণ, দরদ-ব্যথা ও বিনয়ের সাথে ওই বিষয়টি খারাপ হওয়া প্রমাণিত করুন। তাহলে শ্রোতারাই তাকে খারাপ বলা শুরু করবে, তার খারাবির বিরোধিতা করবে।

ইন্টারনেটে দাওয়াত: জিহাদ নষ্টের কারণ?

ইন্টারনেট আধুনিক যুগের এমন এক ফেতনা, যার ভয়াবহতা প্রকাশের জন্য ফেতনা শব্দও যথেষ্ট নয়। মোবাইলের স্ক্রিনে আঙ্গুলের কয়েকটি স্পর্শ অনেক মজার। কিন্তু এটা এমন ভয়ানক এক খাঁদ, যার প্রশস্ততা ও গভীরতার কোন সীমারেখা নেই। ইন্টারনেটের এই সয়লাবের কারণে প্রবৃত্তির চাহিদা ও (দ্বীনের ব্যাপারে) সংশয় অনেক বেশি বেড়েছে। এখন মানুষের মন মস্তিষ্ক স্বাধীনভাবে কাজ করে না। বরং কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিন এখন মানুষের মন মস্তিস্ককে পরিচালনা করে।

এই ইন্টারনেট কত জীবনকে লাগাতার চিন্তায় মগ্ন করে দিয়েছে, আর কত প্রবৃত্তিকে সীমাহীন পিপাসায় লিপ্ত করে দিয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কত হতভাগার জীবনকে এই অজগরের সাথে বন্ধুত্বই শেষ করে দিয়েছে। মানব ইতিহাসে শয়তান সম্ভবত এমন সহজ আর কোন ফেতনার উপায় বের করতে পারে নি। আজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে শয়তান যা অর্জন করতে পারছে ইতিপূর্বে এত সহজে এত অর্জন করতে পারে নি। শয়তান এখন খুব সহজেই মানুষকে নিজের শয়তানির জালে ফাঁসিয়ে ক্ষতি ও ধ্বংসের অন্ধকার গর্তে ফেলে দিচ্ছে। এতকিছু সত্ত্বেও এই ভয়ানক ফেতনা কিছু কিছু কারণে দ্বীন ও জিহাদের একটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যেহেতু মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করার জন্য এটি একটি সহজ মাধ্যম, তাই সফলতার দিকে আহ্বানকারী দাঈগণও নিরুপায় হয়ে এটাকে ব্যবহার করেন।

বর্তমানে যুবকদের একটি শ্রেণী ইন্টারনেটে দাওয়াত পেয়েই জিহাদি আন্দোলনে শরিক হচ্ছে। জিহাদের ময়দানেও কিছু সংখ্যক মুজাহিদ নেটের সাথে যুক্ত থাকেন। এজন্য জিহাদি মানহাজের কাজও একটা স্তর পর্যন্ত নেটেই হচ্ছে।

বাস্তবে নেটের এই দাওয়াতি কাজ দ্বারা 'সর্বাত্মকভাবে জিহাদি আন্দোলনের খুব বেশি উপকার হচ্ছে' তা নয়। ফায়দা তো তখন হবে যখন এই দাওয়াতি কাজে লিপ্ত ভাইয়েরা - বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত থেকে, দাওয়াতের শরয়ী আদব রক্ষা করে দাওয়াত প্রদান করবেন। যদি দাওয়াত গুলুতে আক্রান্ত হয় - দাওয়াতের মূলভিত্তি যদি জ্ঞান, বিবেকের বিপরীতে শুধু জযবা ও ভাসাভাসা কথা

হয় - যদি জিহাদের দাওয়াতের নামে এমন শরিয়ত বহির্ভূত পন্থা অবলম্বন করা হয় যাতে মানুষ আরো দূরে সরে যায় - তাহলে এর দ্বারা শুধু জিহাদি দাওয়াতই নষ্ট হয় না, বরং এই দাওয়াত জিহাদি আন্দোলন নষ্ট হওয়ার বড় একটি কারণ হয়ে দাড়ায়। নিকট অতীতে প্রত্যেক চক্ষুষ্মানরাই দেখেছে - আইএসের খারেজী গোষ্ঠী তৈরি করা - তাতে বাতাস দেয়া - যুবকদেরকে বাড়াবাড়ির অন্ধকারে নিক্ষেপ করা এবং শরিয়তবহির্ভূত দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অনেক বড় অবদান রেখেছে। তবে নেটের প্রচারণা সমষ্টিগতভাবে দাওয়াতের একটি মেজাজ সৃষ্টি করে। কিন্তু দাওয়াতের এই মেজাজ যদি বেআদবির সাথে হয় এবং এর পদ্ধতি যদি অশালীন ও শরিয়তবহির্ভূত হয় - তাহলে তা দ্বীনের দাওয়াত ও মুজাহিদদের এত ক্ষতি করে, যা দ্বীনের দুশমনরাও করতে পারে না।

বেড়ায় ক্ষেত খায়!!

দশ-বার বছর পূর্বে আমেরিকার ‘RAND Corporation’ এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে: জোর-জবরদস্তি করে জিহাদি আন্দোলনকে ধ্বংস করা কষ্টকর। এই আন্দোলন আমাদের বাঁধা-বিপত্তি সত্ত্বেও উন্নতি লাভ করছে। এই স্রোত তখনই বন্ধ হবে - যখন জিহাদি আন্দোলনে এমন চিন্তা লালিত হবে এবং জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা এমন কাজ করা শুরু করবে - যাতে ‘জিহাদ’ নিজে নিজেই ঘৃণিত হয়ে যায় এবং জিহাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। রিপোর্ট অনুযায়ী - এটা তখনই হতে পারে, যখন জিহাদি দলের মাঝে আমরা এমন ব্যক্তি তালাশ করবো, যারা সর্বদা নিজেদেরকে সঠিক মনে করে। মুসলমান জনসাধারণ এবং অন্যান্য দ্বীনদারদের সাথে খুব শক্ত আচরণ করে। এবং যারা তাদের সাথে একটু দ্বিমত করে তাকেই কাফের ফতোয়া দেয়। রিপোর্টের মধ্যে বলা হয়েছে, ‘এই মেজাজের যদি উন্নতি করা যায় তাহলে জিহাদি আন্দোলনকে ধ্বংস করা, জিহাদিদের হাতে তার শিকড় কাটা এবং জিহাদের দাওয়াতকে ধ্বংস করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে’। রিপোর্টে এটাও বলা হয়েছে যে, এই ধরণের লোক নেটেই পাওয়া সম্ভব। এবং তাদেরকে নেটের মাধ্যমেই জিহাদিদের মধ্যে তৈরি করা সম্ভব।

ইন্টারনেটের ট্র্যাজেডি - জযবা ও চেতনা গ্রহণ

ইন্টারনেটের ট্র্যাজেডি হলো; এখানে জিহাদি পেইজ আপডেটকারীর, ট্রেন্ড চালনাকারীর, দাওয়াত প্রদানকারীর এবং কমেন্টকারীর কারোই আসল কৃতি সাধারণত দেখা যায় না। সে তাকওয়া, আখলাকের অধিকারী দ্বীনের দাঈ, মুজাহিদ? নাকি এসব থেকে মুক্ত দ্বীনের দুশমন? তার আসল অবস্থা ইন্টারনেটে জানা যায় না। বরং স্ক্রিনে যা লেখা থাকে, যা দেখা যায় তাই তার পরিচয় হয়ে যায়। এখন যখন নিজের পরিচয় গোপন করা সহজসাধ্য, তাই খুব সহজে মানুষের জযবা অর্জন করা যায়। আর দ্বীনের শত্রু বন্ধু সেজে দ্বীনদার লোকদের ক্ষতি করতে পারে।

যদি শরয়ী ইলম, জিহাদের বুঝ, নেককার লোকদের সোহবত এবং দ্বীনী আখলাকের কমতি থাকে, তবে এমন ব্যক্তি যেকোন সময় তাদের জালে ফেঁসে দ্বীনের শত্রুদের চিন্তাকে জিহাদের আসল মেজাজ মনে করতে পারে। বিশেষ করে যখন এই লোক বিশটি কথার মধ্যে পনেরটি সঠিক বলে, আর পাঁচটি কথা এমন বলে যা জিহাদের রোখ পরিবর্তন ও নবীনদেরকে গুলুর মধ্যে ফাঁসানোর জন্য বলে। ফলে এই পাঁচটি কথাই ওই পনেরটি কথাকে নষ্ট করে দেয়। দ্বীনের দুশমন এই কথাগুলো দ্বারা শ্রোতাকে গোমরাহ করে দেয়। এজন্য আমাদের জন্য জরুরি হলো সঠিক জিহাদ ও গুলুকারীদের মাঝে পার্থক্যের বিষয়গুলো জানা।

গুলুকারীদের সাথে এখতেলাফের কারণ

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যদি আমরা একটু ওইদিকে লক্ষ করি তাহলে জিহাদি আন্দোলনকে গুলু তথা সীমালঙ্ঘন থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে। তা হলো, গুলুকারীদের সাথে আমাদের মতবিরোধ টার্গেটের ক্ষেত্রে নয়। তারাও কুফুরী শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করা ও ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে টার্গেট বানিয়েছে। আমরাও তাকে টার্গেট মনে করি। মতবিরোধ টার্গেটে নয় মতবিরোধ হলো টার্গেটে পৌঁছার রাস্তায়।

গুলুআক্রান্ত ব্যক্তিরাও আসল টার্গেটকেই টার্গেট বলে। কিন্তু দাওয়াতের পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে হলো মতবিরোধ। গুলু আক্রান্ত ব্যক্তিরা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য, টার্গেটে পৌঁছার জন্য যেই পদ্ধতি অবলম্বন করে তা শরিয়ত বহির্ভূত এবং জিহাদি আন্দোলনকে ধ্বংসকারী পদ্ধতি। শুধু তাই নয় বরং তা জিহাদের দাওয়াতের জন্য

অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি একটি আলাদা বিষয় যে – কেউ কেউ কাজের পদ্ধতিতে মতবিরোধ থাকার কারণে টার্গেট তথা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার বিষয়টির ক্ষেত্রেও একমত হয় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কখনো কখনো টার্গেটও পরিবর্তন হয়ে যায়।

এই ধরণের ব্যক্তিরা নিজেদের কম বুঝের কারণে শরিয়ত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির মধ্যেও বাড়াবাড়ির শিকার হয়। কিন্তু বলার ক্ষেত্রে তারা ও আমরা শরিয়ত প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনের বিজয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে থাকি। সুতরাং ইন্টারনেটের পাঠকগণ এবং জিহাদের মুহিব্বিনগণ - কুফুরী নেযামকে ভালো মন্দ বলা, মুজাহিদদের সমর্থন করা এবং 'হয়তো শরিয়ত নয়তো শাহাদাত" এই শ্লোগানকে হক্ক যাচায়ের মাপকাঠি হিসেবে মোটেও যথেষ্ট মনে করবেন না।

কুফুরী শাসনব্যবস্থার পতন ও শরিয়ত প্রতিষ্ঠাই আসল বিষয় – এটা সত্য। এই আসল বিষয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার কাজের পদ্ধতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দাওয়াত ও কিতালের মাঝে কি জায়েয কি নাজায়েয সেটা খেয়াল করে দেখতে হবে। কি কাজ করলে উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আর কোন কাজ করলে উদ্দেশ্যের পথ দীর্ঘ হয়ে যায় – সেটা বিশ্লেষণ করতে হবে। দাওয়াতের কোন পদ্ধতি জিহাদের উপকার করে আর কোন পদ্ধতি জিহাদের ক্ষতি করে – এটার উপর গবেষণা করতে হবে। আর এ সমস্ত বিষয়গুলোই মতবিরোধের কারণ হয়ে দাড়ায়। আর এর মাঝেই জিহাদি আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতা নিহিত।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কাজের পদ্ধতির এই পার্থক্য দ্বারাই আসল নকল চেনা যায়। কিন্তু যদি এদিকে খেয়াল না করা হয় বরং যেই জিহাদের কথা বলে তাকেই যদি নিজেদের সফর সঙ্গী, জিহাদের সৈনিক মনে করা শুরু করি - তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জিহাদের ইতিহাসে অনেকবার এমন হয়েছে যে, জিহাদের দাওয়াতই জিহাদি আন্দোলনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য খুবই জরুরি বিষয় হলো আমরা জিহাদের বন্ধু সেজে থাকা শত্রুদের থেকে জিহাদি আন্দোলনকে হেফাযত করবো। আর তাদের মোকাবেলায় আমাদের ভিতরগত নিরাপত্তা জোরদার করবো।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

আমাদের নিকট গোয়েন্দা ও শত্রুদের অস্ত্রের মোকাবেলা করার এন্তেযাম আছে। কিন্তু জিহাদি আন্দোলনকে সঠিক রাস্তা থেকে সড়ানোর জন্য যে ছিদ্র করা হয় তা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই। যদি শত্রু কোন মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে প্রবেশ করে জীবন শেষ করতে চায়, তাহলে সম্ভাবনা আছে সে গ্রেফতার হবে। কারণ এই উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত আছে। কিন্তু চিন্তাগত সমস্যার দূরীকরণে কোন মজবুত ব্যবস্থা নেই।

অথচ বাস্তবতা হলো চিন্তা চেতনা ধ্বংস করাই হলো বেশি ভয়ানক। কারণ মানুষ ফিকির ও আমলের নাম। আর আমল ফিকিরের অনুগামী হয়। যদি ফিকির সঠিক হয় তাহলে আমলও উপকারী হবে। আর যদি ফিকির সঠিক না হয় এবং নিজের লাভ ক্ষতির মানদন্ড নষ্ট হয়ে যায় তবে যেই জিনিস জিহাদের জন্য উপকারী তা এই ব্যক্তির কাছে খারাপ মনে হবে। আর যেটা জিহাদের জন্য খারাপ, সেটাই তার কাছে ভালো লাগবে। এমন যখন হবে তখন আসলে নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করা হবে। আর এ অবস্থায় আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য কোন বুঝমান শক্তিশালী শত্রুরও প্রয়োজন হবে না। শত্রু তো দূরে বসে নিজের হাতে জিহাদি আন্দোলন ধ্বংস হওয়ার তামাশা দেখবে।

সুতরাং এক্ষেত্রে এমন নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার, যাতে করে কোন ব্যক্তি আলেম বা দাঈ সেজে জিহাদের ধ্বংসকারী চিন্তা চেতনা জিহাদিদের মাঝে ছড়াতে না পারে। তখনই তাদের রাস্তা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই- বাছাই করার জন্য শুধুমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, কে কত পরিমাণ জিহাদের কথা বলে, বা কতটুকু কুফুরি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলে, বা কতটুকু মারা ও মরার উপর উদ্বুদ্ধ করে। যদি কোন ব্যক্তি এর সবগুলো করে, কিন্তু এমন টার্গেটের কথা বলে যা সম্পূর্ণ শরিয়ত বহির্ভূত অথবা জিহাদের আন্দোলনের জন্য খুব ক্ষতিকর - তাহলে কি এই লোকের তার চিন্তা-ফিকির ছড়ানোর অনুমতি থাকা উচিৎ?

এই ব্যক্তির নিজের চিন্তা-চেতনার উপর আমল করা বা করানোর সুযোগ কি থাকা উচিৎ যদিও সে জিহাদের কথা বলে? জিহাদের ইতিহাস সাক্ষী, এসমস্ত চিন্তা-চেতনা মুজাহিদদের জন্য শত্রুদের অস্ত্র থেকেও বেশি ক্ষতিকর। এসমস্ত ব্যক্তিদের

উপর যদি এমন পাবন্দি না লাগানো হয় তাহলে তারা এমন ক্ষতি করবে যা প্রকাশ্য শত্রুরাও করতে পারে না।

বাস্তবতা হলো, জিহাদর মধ্যে হকপন্থী হওয়ার জন্য শুধুমাত্র এই একটি আলামতই যথেষ্ট নয় যে, সে শরিয়তে হত্যা জায়েয এমন ব্যক্তিদের হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটি একটি আলামত অবশ্যই কিন্তু এটি মোটেও যথেষ্ট নয়।

বরং আহলে হকের বড় একটি আলামত হলো ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা থেকে বাঁধা দেয়া, যাদেরকে হত্যা করা শরিয়ত ও জিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল। যদি কোন ব্যক্তি বাতিল শাসনব্যবস্থার রক্ষকদের ও কাফেরদের হত্যা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, সাথে সাথে মুসলমানদেরকেও হত্যার রাস্তা দেখায়, তাহলে এটা অবশ্যই চিন্তাগত ছিদ্র যার দ্বারা সর্বদা কাফেররা লাভবান হয়েছে আর মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অবস্থা দাওয়াতের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও। যদি কেউ এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেয় যা শরিয়তবহির্ভুত, তাহলে তা বন্ধ করা জরুরি। এজন্যও আমাদের পুরোপুরি ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরি। সারকথা হলো এমন কার্যক্রম বন্ধ করা ছাড়া জিহাদের দাওয়াত কখনও উন্নতি লাভ করবে না, এবং জিহাদি আন্দোলন কখনও শক্তিশালী হবেনা।

ইন্টারনেটের ষড়যন্ত্র এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনের হেফাযতের গুরুত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক

মুজাহিদ ও জিহাদের মানহাজের হেফাযত ও শক্তিশালী করা দুটি আলাদা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুটির কোন একটির ব্যাপারে অবহেলা অপূরণীয় ক্ষতির কারণ। বাস্তবতা হলো - জিহাদের মানহাজের হেফাযত মুজাহিদদের হেফাযত থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মুজাহিদদের দৌড়-ঝাপ, কুরবানির উদ্দেশ্যই হলো হকের দাওয়াত ও পয়গাম বিজয়ী হোক। কিন্তু মানহাজ যদি খারাপ হয়, সফরের রাস্তা যদি ভুল হয়ে যায়, তখন মুসাফির যতই উদ্দীপনা ও ইখলাসের সাথে পথ চলুক, সে কখনও মনযিলে পৌঁছতে পারবে না।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ অবস্থায় দাওয়াত নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আন্দোলন নিজের কর্মীদের দ্বারাই বরবাদ হয়ে যায়। আর যদি মানহাজ সহিহ হয়

তাহলে তা তখনই সফল হয় যখন তার কর্মীরা শক্তিশালী হয় এবং সম্মুখসমরেও বিজয়ী হয়। সুতরাং মুজাহিদ ও জিহাদের মানহাজ রক্ষা ও শক্তিশালী করা, উভয়টিই জরুরি এবং একটি আরেকটির সাথে সম্পৃক্ত।

দ্বীনের দুশমনদের যুদ্ধ এই দুই ময়দানেই চালু আছে। তারা জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। বিভিন্ন পন্থায় তাদেরকে হত্যা করা, বন্দী করা এবং তাদের বস্তুগত ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত। অন্যদিকে তারা জিহাদের মানহাজ নষ্ট করা ও জিহাদি কাফেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন চালবাজি করছে। তারা এই উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটও ব্যবহার করে। সুতরাং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ভাইদের দুশমনের এই দুই হামলার পদ্ধতি জানা এবং তা থেকে সতর্ক থাকা জরুরি।

আসল-নকল চিহ্নিতকরণ

সব ময়দানেই আসল নকলের লড়াই থাকে। মার্কেটের মধ্যে আসল জিনিস শেষ করার জন্য নকল জিনিসটি পরিচিত করানো হয়। বিভিন্নভাবে নকলের খুব প্রচার করা হয়। হক বাতিলের এই লড়াইয়েও বাতিল এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

এটি তো স্পষ্ট যে, বাতিল হকের দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারে না, কিন্তু যদি বাতিল হকের সাইনবোর্ড, ব্যানার সহকারে উপস্থিত হয় - তাহলে হকের কিছু না কিছু ক্ষতি হয়। আমেরিকার র‘RAND Corporation’ এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল - যদি মুসলিমরা মোল্লা উমর দাড় করায়, তাহলে আমাদের মোল্লা ব্রেডলি (নকল মোল্লা) দাড় করানো উচিৎ।

এজন্য আমেরিকার ওই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে, যারা বাহ্যিকভাবে হকের দাওয়াত দেয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা মানুষকে হক থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। যেহেতু আল্লাহ মানুষের স্বভাবে হকের প্রতি আকর্ষণ রেখেছেন (যদি অন্তর নষ্ট না হয়ে থাকে) এজন্য বাতিল শুধু বাতিল বেশে, বাতিল শিরোনামে হকের পথে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারে না। সে হয়ত স্বভাব-প্রকৃতি নষ্ট করে দিতে পারে। ফলে হিরোইন ও বিষকে মহৌষধ মনে করে সেবন করে। অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে ধোঁকার আশ্রয় নেয়, আর নিজেদের বাতিলের উপর হকের লেভেল লাগিয়ে লোকদেরকে হকের নামে গোমরাহ করে।

নেটের জগতে উভয় কাজই হয়। একদিকে স্বভাব নষ্ট করার খুব চেষ্টা হচ্ছে, অন্যদিকে জিহাদি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজির জাল বিছানো হচ্ছে। ভুল চিন্তা-চেতনা ও আমলকে সঠিক হিসেবে খুব প্রচার করা হচ্ছে। হক্ক পছন্দকারী ব্যক্তিদের সামনে গোমরাহীর রাস্তাকে সঠিক বলে দেখানো হচ্ছে। এ অবস্থায় মনযিলে মাকসুদে পৌঁছতে আগ্রহী ব্যক্তি, যার জযবার সাথে প্রয়োজনীয় হুশ নেই, সঠিক ইলম অর্জনে আগ্রহী নয়, সে ওই ধোঁকার শিকার হয়। এই কপালপোড়া জিহাদের নামে নিজেও ধ্বংস হয়, সেই সাথে জিহাদি কাফেলারও বদনামের কারণ হয়। এ অবস্থায় শুধু ওই ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, যে জিহাদের জযবার সাথে জিহাদের বুঝ এবং হুশ ঠিক রাখে। এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি শরিয়তের ইলমের বাতি হাতে নেয়, তারপর পূর্ববর্তী মুজাহিদদের দেখানো রাস্তায় চলতে থাকে।

স্মরণ ও সতর্ককরণ

জিহাদের রাস্তা অতিক্রমকারী মুজাহিদদেরকে এখানে একটি সমস্যা ও শত্রুদের একটি নিকৃষ্ট চাল সম্পর্কে সতর্ক করা জরুরি মনে করছি। তবে তার আগে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তা হলো জিহাদের রাস্তা ধৈর্য ও সংকল্পের রাস্তা। এ রাস্তা কাঁটায় ভরা, তবুও এ রাস্তায় শেষ পর্যন্ত চলতে হয় কারণ এটি জান্নাতের রাস্তা। এ পথে চলা ইচ্ছাধীন নয়, বরং বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হল এ রাস্তায় চলা।

আপনারা জানেন যে, এ রাস্তায় চলা কখনও সহজ ছিল না। একারণেই প্রথম থেকেই মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য করে আসছে। এ অবস্থায় যে বাস্তবিক পক্ষেই আখেরাতকে চায়, যে সত্যিকারেই আল্লাহকে ভালোবাসে, যে উম্মতের এই দুর্দশায় আসলেই ব্যথিত, সে এই রাস্তায় পাহাড়ের মত কঠিন সমস্যাকেও হাসিমুখে বরণ করে নেয়। সে জিহাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরাপদ জিন্দেগী গ্রহণ করাকে আযাব মনে করে।

সে বুঝে যে, এখানের দৌড়-ঝাপ, চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কষ্ট-মসিবত, পেরেশানী, মারপিট, বন্দীত্ব, অনাহার, দেশান্তর এবং মৃত্যু সবই (আযর ও সাওয়াবের) মাইলপোষ্ট। তাই তারা এসব বিপদ দেখে ঘাবড়ায় না। অস্ত্র রেখে দেয় না, ভীত হয়

না। বরং বিপদাপদের সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহর কাছে তাওফিক চেয়ে বিপদের এই পাহাড় কেটে নিজের জন্য জান্নাতের রাস্তা তৈরি করে। সে জানে আখেরাতের পথিক দ্বীনের দুশমনের শক্তি দেখে ভীত হয় না। তাদের ধোঁকাপূর্ণ চালবাজি ও ষড়যন্ত্র দেখে মন খারাপ করেনা। সে বুঝে হক রাস্তার হাতিয়ার হলো তাকওয়া ও সবর। এই দুটি জিনিস যদি থাকে তাহলে বাতিলের সমস্ত ষড়যন্ত্র, চালবাজি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তার বান্দাকে এই মহাসড়কে চলার তাওফিক দান করেন। এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যান।

সতর্ককরণ হলো-

হকের রাস্তায় বাতিলের পক্ষ থেকে একটি বাঁধা হলো তাদের ধোঁকা। এটা এমন একটা চাল, যা বাতিল নিজের শক্তি শেষ হয়ে গেলে এবং সমস্ত মাধ্যম অকেজো হয়ে গেলে ব্যবহার করে। সব শক্তি শেষ হয়ে গেলে ধোঁকাবাজির জাল বিছায়। তাদের ধোঁকার একটি হলো তাদের কিছু গোলাম - মুজাহিদ, দাঈ সেজে ইন্টারনেটের পথে মুখলিস মুজাহিদ পর্যন্ত পৌঁছে, এবং তাকে ফাঁসিয়ে জেলে বন্দী করে। এই জাল তো মাকড়সার জালের মত দুর্বল, কিন্তু মুজাহিদদের গাফলতির কারণে অনেক সময় তা ভয়ানক হয়ে উঠে।

দুশমনের এই সম্ভাব্য চাল যদি আগেই বুঝা যায়, তাহলে এর মোকাবেলা করা খুবই সহজ। দুশমন এক্ষেত্রেও ব্যর্থ হবে। কিন্তু এই ধরণের চাল সম্পর্কে যদি কোন ধারণাই না থাকে, তাহলে যেই জিহাদের কথা বলবে তাকেই সত্যিকারের মুজাহিদ মনে হতে থাকবে। আর এভাবেই আমরা নিজ পায়ে হেটে জালে আবদ্ধ হব। আরব হোক বা আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ হোক বা উপমহাদেশ হোক সব জায়গায়ই দ্বীনের দুশমনরা এই চালবজি করছে। সুতরাং তাদেরকে চেনা এবং চিহ্নিত করা জরুরি।

আমরা ইন্টারনেটে এক্ষেত্রে দুই ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই। আমাদের পাঠক ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে উভয় চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার জন্য তৈরি করা জরুরি।

একটি চ্যালেঞ্জ হলো সহিহ জিহাদি মানহাজকে বুঝা, শুধু তাকেই গ্রহণ করা এবং তাতেই অগ্রসর হওয়া।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো - গোয়েন্দাদের অপতৎপরতা থেকে বাঁচা এবং শুধু আসল মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।

ইন্টারনেট ও তার বাহিরে আমাদের এই চ্যালেঞ্জের সাথে যদি সংগ্রাম করতে হয়, আর আমরা জিহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা আমাদের বুনিয়াদি দাওয়াতের অংশ না বানাই, তাহলে এটা হবে ওই ব্যক্তির মত যে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিলো কিন্তু সাতারের কোন খবর নেই। আল্লাহ আমাদেরকে এই ময়দানের হাতিয়ার গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

নিরাপত্তার জুজুবুড়ি ও জিহাদের দাঈদের করণীয়

দ্বীনের দুশমনদের চাহিদা হলো যুবকরা নেটে সবধরনের খারাপ জিনিস দেখুক, সব অশ্লীলতার গর্তে প্রবেশ করুক, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আসল জীবনের পথ দেখায় এমন বিষয় থেকে (দ্বীনের দাওয়াত ও জিহাদ থেকে) দূরে থাকুক। তাদের চেষ্টা হলো নেটে এমন এক পরিবেশ তৈরি করা, যাতে জিহাদ বিষয়ে কোন কিছু দেখলেই যুবকদের অন্তর কাঁপা শুরু হয় এবং এমন মনে করে যে, এসব বিষয় দেখলেই জিহাদের দুশমনরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গুম করে ফেলবে।

দুশমন তাদের এই চাহিদা ও চেষ্টাকে গোপন করেনি। বরং তাদের "RAND Corporation" তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে: নেটে নিরাপত্তার একটি ধোঁয়া তোলা উচিৎ (জিহাদি বিষয় দেখা রিস্ক, দেখলেই ধরবে এমন মানসিকতা সৃষ্টি করা)। এর দ্বারা অধিকাংশ মানুষ জিহাদি পেইজ ও সাইট থেকে দূরে সরে যাবে। নেটে দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ভাইদের জন্য জরুরি হলো এই ভয়ের চিকিৎসা করবে। তাদেরকে বুঝাবে যে, শুধু বিষয়টি দেখা বা পড়ার দ্বারা কোন সমস্যা হয় না। সাথে সাথে তাদেরকে এমন টেকনিক শেখাবে, যাতে নিজেকে নিরাপদ রেখে দাওয়াতি বিষয় পড়তে পারে। বাস্তবতা হলো শুধু জিহাদি বিষয় দেখা পড়ার দ্বারা কোন ক্ষতি নেই, সমস্যা হলো দাঈর বেশে থাকা বহুরুপি ইসলামের দুশমনকে আসল দাঈ মনে করা। তাকে নিজের আসল অবস্থান বলা, তার সাথে অফলাইনে সম্পর্ক করা। অথবা জিহাদ ধ্বংসকারী মানহাজকে আসল মানহাজ মনে করা। নেটের এই দুই দিকের সমস্যা বুঝা ও বেঁচে থাকা সকলের জন্য জরুরি।

ষড়যন্ত্র মোকাবেলার তিনটি পদ্ধতি

নেট ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা তিন ভাবে করা যায়-

এক. জিহাদি মানহাজের বুঝ পরিপূর্ণরূপে অর্জন করা। এই মানহাজ কি? কোথা থেকে এই মানহাজকে নেব? দাওয়াত ও জিহাদের প্রত্যেক বাঁক, ধ্বংসাত্মক গর্ত এবং প্রত্যেক দুই রাস্তাকে চেনা। যাতে পা না ফসকে যায় আর না ভুল রাস্তায় চলা শুরু করে। এবিষয়ে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে যে, জিহাদি ফিকির, মানহাজ, জায়েয-নাজায়েয, উপকার-ক্ষতির ইলম.. জিহাদি আন্দোলনের গ্রহণযোগ্য উলামা ও উমারা থেকে নেওয়া।

তেমনিভাবে জিহাদের দাঈ ও মুজাহিদের এমন যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করতে থাকা, যাতে করে সঠিক-ভুল, উপকারী-অপকারী ফিকির ও আমলের মাঝে বিচক্ষণতার সাথে পার্থক্য করতে পারে। আর যখনই কোন জিহাদের শত্রু জিহাদের দাঈ বা মুজাহিদ সেজে জিহাদের মানহাজের মাঝে ছিদ্র তৈরি করতে চায়, তখনই যাতে সাথে সাথে তাকে পাকড়াও করতে পারে। এমন ব্যক্তি থেকে নিজে পৃথক হয়ে যাওয়া, অন্যকে তার ব্যাপারে সতর্ক করা এবং তাদেরকে একদম একঘরে করে ফেলা জরুরি। এটা নাহি আনিল মুনকার। আর জিহাদি দলগুলোর মাঝে এই ব্যাপারে অবহেলা আছে যার কারণে শাম, ইরাক থেকে খোরাসান পর্যন্ত অনেক খেসারত দিতে হয়েছে।

দুই. জিহাদের নেতা ও ময়দানের প্রতিনিধিদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। এজন্য নেটের সাধারণ মাধ্যম পরিহার করে এমন মাধ্যম ব্যবহার করা যাতে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তির অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়। আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালোভাবেই এই ব্যবস্থাপনা করা আছে। মুজাহিদদের পরিভাষায় একে তাযকিয়া নেয়া বলে। আলহামদুলিল্লাহ খোরাসান থেকে ইয়েমেন, মালি পর্যন্ত জিহাদি আন্দোলন এই মাধ্যমে খুব জোরেশোরে চলছে।

সুতরাং ইন্টারনেটে যদি কোন জিহাদের দাঈ বা মুজাহিদ সরাসরি সাক্ষাৎ বা জিহাদি কাজে সাহায্য করতে চায় অথবা জিহাদি গোপন বিষয় জানার চেষ্টা করে তাহলে এই ব্যক্তির সাথে চলাফেরার ব্যাপারে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে

হবে। এই ব্যক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ খবর নেবে। আমি আবারও বলছি, ওই ব্যক্তির ব্যাপারে জিহাদের আসল ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে তার ব্যাপারে খোজ খবর নেবে। তাযকিয়া নেবে। তাযকিয়া অর্জন হলে তার সাথে সরাসরি সাক্ষাতে কিংবা অন্যান্য বিষয়ে সমস্যা নেই। এই তাযকিয়া অর্জন করা কোন কঠিন কিছু নয়।[১] ইন্টারনেটে আলহামদুলিল্লাহ মুজাহিদদের প্রতিনিধিত্বকারী পেইজ, ওয়েবসাইট ও চ্যানেল বিদ্যমান আছে। যার এডমিনশিপ (Adminship) গ্রহণযোগ্য মুজাহিদদের হাতে আছে। এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করা যায়।

তিন. মুজাহিদদের কাতারে গোয়েন্দা বিভাগ, Intelligence System কে প্রশস্ত ও শক্তিশালী করা। এই ব্যবস্থাপনাও আলহামদুলিল্লাহ্ বিদ্যমান আছে। কিন্তু একে অভিজ্ঞ ও আলেমদের হতে এমন ব্যক্তিদের অধীনে হওয়া উচিৎ যারা দূরদর্শী। এবং যাদের নেগরানীতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তির ক্ষতি হয় না এবং কোন অপরাধী সহজে পার পায় না।

যদি উপড়ে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ে গুরত্বারোপ করা হয় তাহলে আশা করা যায় জিহাদের মানহাজও হেফাযতে থাকবে এবং গোয়েন্দাদের জন্য জমিন সংকীর্ণ হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় বড় বড় দাবাড়ুও মুজাহিদদের বড় কোন ক্ষতি করতে পারবে না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমি ধোঁকাবাজ নই, আর আমাকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়"।

এটা তো জীবনের সকল বিষয়ে হওয়া উচিৎ। আর জিহাদের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি এ বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার। আর এই ধরণের সতর্কতাই জিহাদি ঈমানের চাহিদা।

---

[১] এই নীতি বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়, এখানের জন্য নীতি হল- আমরা অনলাইনে কোন সাথী রিক্রুট করি না এবং শুধুমাত্র অনলাইনে পরিচিত হয়ে অফলাইনে সরাসরি সাক্ষাত সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করি, চাই ব্যক্তি অনলাইন তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যতই পরিচিত ও বিশ্বস্ত বলে বিবেচিত হন না কেন!

জিহাদের দাঈদের খেদমতে কিছু কথা

আমরা আবার দাওয়াত বিষয়ে ফিরে আসি। জিহাদের দাওয়াত ও মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ভাইদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো ইনশা আল্লাহ। আশা করি এই কথাগুলো জিহাদি মানহাজের উন্নতি ও হেফাযতের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হবে।

১. দাওয়াতের ময়দানে জিহাদি আন্দোলন যেন কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত না হয়। লক্ষ্য যেন এমন না হয় যে, এক শ্রেণীর শাসকদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে আরেক শ্রেণীর শাসকদেরকে ক্ষমতায় বসানো। আর এমনটা হলে সেটা আর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থাকবে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহর সবচাইতে পছন্দের ইবাদত। আর এটি তখনই জিহাদ ও ইবাদাত থাকে যখন তার সর্বদিকেই আল্লাহর সাথে এক গভীর সম্পর্ক তৈরী করা হয় এবং সুন্নতের অনুসরণ করা হয়। আল্লাহর সাথে এই সম্পর্ক ও সুন্নতের পাবন্দি আমাদের দাওয়াত, মিডিয়া এবং জিহাদের অন্যান্য আমলে স্পষ্ট থাকা উচিৎ।

২. জিহাদের দাঈ শুধু ফিকরী আলোচনা করবে না। অন্তর ও আত্মাকে পবিত্র রাখা, আখালক চরিত্র সমুন্নত হওয়ার আলোচনাও খুব জরুরি। এটাও দাওয়াতের মৌলিক টার্গেট।

সুতরাং জিহাদের দাঈর জন্য তাযকিয়া, ইহসান, সীরাত ও আখলাক সুন্দর করার বিষয়বস্তুকেও দাওয়াতের স্বতন্ত্র অংশ বানানো উচিৎ। যার দ্বারা দাঈরও উপকার হবে, শ্রোতারও উপকার হবে। যদি এ বিষয়ের প্রতি গুরত্বারোপ না করা হয় তাহলে অন্তর শক্ত হয়ে যায় আর এর দ্বারা আচরণ-উচ্চারণ এমন শক্ত হয়ে যায় যে, এর দ্বারা দাঈ নিজেও ধ্বংস হয়ে যায়, এবং দাওয়াতেরও ক্ষতি করে।

৩. যেহেতু কথা ও কাজ উভয়টি সঠিক হওয়ার জন্য শরীয়তের ইলম জরুরি। কিন্তু দাওয়াতের বিষয়টি আরো একটু সংবেদনশীল। কারণ এর দ্বারা অন্যদেরকেও একটি বিশেষ ফিকির ও চেষ্টার দিকে আহবান করা হয়। একারণে দাওয়াতের জন্য ইলমকে ছহিহ করা বেশি জরুরি। এ উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটে জিহাদের দাওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত ভাইদের জন্য জরুরি হলো ইলমে দ্বীন ও ফাহমে জিহাদকে বাড়ানো এবং দাওয়াতের পদ্ধতি সুন্দর করার জন্য বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিৎ।

তার জন্য অন্যান্য উলামায়ে কেরামের সাথে জিহাদি আন্দোলনের উলামায়ে কেরাম ও তাদের কিতাবসমুহের দিকে দৃষ্টিপাত জরুরি। সবচেয়ে উত্তম হলো দাওয়াত ও মিডিয়ার কাজ পুরোপুরি উলামায়ে কেরামের নেগরানীতে করা। এর কারণ হলো ভাসাভাসা ইলমের কারণে অযথা তর্ক বিতর্ক, বেহুদা বাকবিতন্ডা হতে পারে। কিন্তু দাওয়াত হতে পারে না। জিহাদের দাঈর জন্য জরুরি হলো যে বিষয়ের দাওয়াত দেবে তার ফরজ ওয়াজিব মুস্তাহাব আদাবের বিষয়গুলো জানবে।

৪. দাওয়াতের মধ্যে শক্ত ব্যবহার, গালিগালাজ, ভুল উপাধি এবং সব ধরণের খারাপ কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। জরুরি হলো দাঈর কথা কোমল, মন-মস্তিষ্ক আকর্ষণকারী দলিল ও পদ্ধতিতে হবে। এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যার সাথে আলোচনা পর্যালোচনা চলছে সেখানে শুধু সেই সম্বোধিত ব্যক্তিই থাকে না। বরং সম্বোধিত ব্যক্তি শ্রোতা পাঠকও থাকে। তারা যদিও সমর্থক না হয় কিন্তু উভয় পক্ষের দলিল ও দাওয়াতের পদ্ধতি পর্যালোচনা করে। যদি দাঈ ধৈর্য সহকারে দলিলের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এই অসমর্থক শ্রেণীর উপরও প্রভাব পড়ে। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাদেরও কয়েকজন দাঈর পক্ষে কথা বলে। আমরা যেন এই নীতি গ্রহণ না করি যে, সম্বোধিত ব্যক্তি যদি নরম হয় তাহলে আমিও নরম আর সে যদি শক্ত হয় তাহলে আমিও কঠোর আচরন করবো। বরং উচিৎ হলো সে যেমনই হোক দাঈর ব্যবহার সুন্দর হতে হবে।

৫. জিহাদের দাঈর উপর নফসের চাহিদা, অতি জযবা, গোস্বা ও প্রতিশোধস্পৃহা যেন প্রবল না হয়। তার পুরো দাওয়াতি আমল বুদ্ধি হেকমত, জ্ঞান ইনসাফ এবং কল্যাণকামিদের মাশওয়ারার অধীন হবে। সে তো বাহাদুর নয় যে সম্বোধিত ব্যক্তিকে আছাড় দেয়। দাঈ তো সেই হেকিম যে সর্বদা চিন্তা করে তার কোন ভুলের কারণে রোগীর অসুস্থতা বেড়ে না যায়। সে ইলম ও হেকমতের সাথে কাজ নেয় এবং সর্বদা চেষ্টা করে যেকোনভাবে সম্বোধিত ব্যক্তির মনের দরজা খুলে তাতে নিজের কথা প্রবেশ করাবে।

৬. দাঈ সম্বোধিত ব্যক্তির মন ও মস্তিস্ক উভয়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। তার কথা দলিলসমৃদ্ধ হবে যা সম্বোধিত ব্যক্তির মেধাকে আকর্ষণ করবে। এবং দরদ ব্যথার সাথে হবে যা তার অন্তরকে প্রভাবিত করবে। সবসময় শুধু যৌক্তিক কথা প্রভাবিত করে না। আবার সবসময় জযবাতি কথাও উপকারী হয় না। দাঈর

জন্য হেকমত ও মাওয়ায়েযে হাসানা উভয়টি দ্বারাই কাজ নিতে হবে। হেকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই পদ্ধতি যা মেধাকে প্রভাবিত করে, আর মাওয়ায়েযে হাসনা হলো যা অন্তরকে প্রভাবিত করে।

৭. জনসাধারণের সামনে আমাদের বক্তব্য শক্তিশালি হওয়া উচিৎ। দুর্বল বক্তব্য অনুচিৎ। অর্থাৎ এমন বক্তব্য দেয়া হবে, যা কল্যাণ ও সফলতার পথ দেখাবে। এবং অপমান লাঞ্ছণা থেকে মুক্তির রাস্তা দেখাবে। তবে আমাদের কথার মাঝে যেন গর্ব অহঙ্কারের কোন ঘ্রাণও না থাকে। বরং সম্বোধিত ব্যক্তি যেন আমাদের কথায় দরদ ব্যথা বুঝতে পারে।

৮. আমাদের সাথে মতবিরোধ পোষণকারী ভাইদেরকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে দরদ-ব্যথা সমবেদনা এবং কল্যাণকামিতার প্রাধান্য থাকবে। অপমান অপদস্থ করা গালিগালাজ করা কাফের ফতোয়া দেয়া থেকে পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। তেমনিভাবে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও একই আচরণ করা হবে।

৯. দাঈর মুদারাত ও মুদাহানাত (সৌজন্য আচরণ ও চাটুকারিতা) এর মাঝে পার্থক্যের জ্ঞান থাকতে হবে। উভয়ের মাঝে পার্থক্যকারী সীমারেখার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ তার দাওয়াত নরম ভাষায় হতে হবে তবে অসত্যকে কখনও সত্য বলবে না। বরং সমস্ত নরম ব্যবহারের সাথে সাথে হককে হক বাতিলকে বাতিল বলবে।

১০. কুফুরী শাসনব্যবস্থা, তার নেতৃত্ব ও হেফাযতকারীদের শরয়ী হুকুম এবং অন্যান্য কুফুরীগুলো বিস্তারিত বুঝা এবং অন্যকে বুঝানো, এই ব্যাপারে সতর্ক করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাকে গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের কিতাবের মাধ্যমে দাওয়াতের অংশ বানানো উচিৎ। যাতে এ কাজের ভয়াবহতার অনুভূতি তৈরী হয় এবং অন্তরে কুফুরী শাসনব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ বিদ্বেষ তৈরী হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কাউকে কাফের ফতোয়া দেয়া ভিন্ন বিষয়। এবং তা বিচার ফয়ছালার বিষয়, যার দায়িত্ব মুত্তাকি পরহেজগার বুঝমান বিচক্ষণ গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের উপর দেয়া উচিৎ। নির্দিষ্ট তাকফিরের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো গ্রহণযোগ্য উলামাদের অনুসরণ করা। নিজের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি বা দলকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকা। যদি এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা না হয় তাহলে তা

নিজের ঈমানের জন্য আশংকাজনক, এবং দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে অনেক বড় ক্ষতির কারণ।

১১. দ্বীনদার শ্রেণী, ধর্মীয় রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য মতবিরোধকারীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মনে রাখতে হবে, তাদের ভালো কাজের প্রশংসা ও উৎসাহ দেয়া হবে, এবং ভুলের সমালোচনা ও নছিহত করা হবে, গোপন ভুলের ব্যাপারে গোপনে নছিহত, প্রকাশ্য ভুলের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে নছিহত। তাদের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটির কারণে তাদের ভালো কাজকে মোটেও অস্বীকার করা যাবে না। প্রত্যেক জিনিসকে তার আপন জায়গায় রাখা হলো ইনসাফ। মুজাহিদদের জন্য এই ইনসাফ রক্ষা করা অন্যদের জন্য বেশি জরুরি। এভাবে কাজ করলে আমরা একদিকে যুলম থেকে বেঁচে গেলাম, অন্যদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হবে। অন্য দিকে তাদের ভালো কাজের প্রশংসা ও উৎসাহ দেয়ার দ্বারা সে গোড়ামির শিকার হবে না। আর ইনশাআল্লাহ হকের জন্য তার অন্তর খুলে যাবে।

১২. দাওয়াতের মধ্যে সর্বদা একথা বুঝানো যে, আমরা হেদায়াতের পথে আহবানকারী একটি দল। মানুষের সফলতা ও কামিয়াবির জন্য আমরা দাড়িয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর আনুগত্যের রহমতের ছায়ায় নিয়ে আসা। আমরা নিজেদের পরিচয় “কিছু শাস্তি বাস্তবায়ন চাই” দ্বারা করাবো না। অন্য কেউ করলে তাও গ্রহণ করবো না। এই শাস্তিগুলো আমরাও বাস্তবায়ন করবো, কারণ এগুলো শরীয়তের গুরত্বপূর্ণ বিষয়, এবং এর অনেক বরকত আছে। কিন্তু শাস্তি বাস্তবায়ন করাই পূর্ণ শরীয়ত নয়। শরীয়তের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখা, ইনসাফ-ন্যয়বিচার, পবিত্রতা-লজ্জার প্রসার, সাম্য, মানুষের সেবা, ইসলামি সমাজ, জীবনব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করা। ভালো কাজের প্রতি আহবান, সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করা। অসহায়-গরিব মানুষের জন্য যাকাতের ব্যবস্থা, আল্লাহর বিধান কার্যকর করা সহ আরো অনেক গুরত্বপূর্ণ বিষয় আছে। শাস্তি তো শুধু অপরারীদের দেয়া হয়। আর একটি ইসলামি সমাজ যেখানে ইসলমী সমাজ ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে আর কি পরিমান অপরাধ হয়? অন্য দিকে ওই সমাজব্যবস্থা দ্বারা কত মানুষ উপকৃত হয়? স্পষ্টত এই উভয়টির মাঝে কোন মিলই নেই। একটি সমাজের লাখো মানুষের মাঝে কিছু মানুষের নিজেদের ভুলের কারণে যে বিধানের সম্মুখিন হয়, তা দিয়ে

কি কোন শাসনব্যবস্থার পরিচয় করানো যায়? না, বরং যা অধিক ও প্রবল, তা দিয়ে পরিচয় করানো হয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার অগনিত ফায়দা। সর্বোচ্চ সৌন্দর্য, সিমাহীন বরকত এত ব্যপক ও বেশি যে, এর দ্বারা সারা দুনিয়ার মানুষ উপকৃত হয়। তাই আমরা এগুলো দ্বারাই আমাদের পরিচয় দেব। বাতিল শাসনব্যবস্থায় কি কি শাস্তি নেই? তা দ্বারা কি তার আহবানকারীরা বাতিল শাসনব্যবস্থার পরিচয় করায়? না, বরং কথিত উপকারিতার কথা বর্ণনা করে।

১৩. দাওয়াতের মধ্যে 'ধীরে চল' এবং 'অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে কর' নীতির অনুসরণ করা উচিৎ। বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে তার থেকে কম গুরত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ার দ্বারা দাওয়াতের প্রভাব কমে যায়। অথবা সম্বোধিত ব্যক্তি ভুল বুঝে। যেমন সেনাবাহিনীর কারো সাথে আমাদের শত্রুতার কথা বললে প্রথমে তাদের বড় অপরাধ হিসেবে কুফুরী শাসন ব্যবস্থা ও কুফরির লিডারদের রক্ষা করা উল্লেখ করা উচিৎ । আল্লাহকে ছেড়ে টাকা পয়সার গোলামি, সব ধরনের জুলমকে উল্লেখ করা উচিৎ। কিন্তু যদি সৈনিকদের বাদ্যের তালে নাচাকে প্রথম অপরাধ বলা হয় , তাহলে শ্রোতা মুজাহিদদের জিহাদের উদ্দেশ্য সৈনিকদের নাচাকেই মনে করবে। নাচ-গান সৈনিকদের দাড়ি কাটতে বাধ্য করার মত গুনাহের আলোচনাও হওয়া উচিৎ তবে তার আপন জায়গায়। তেমনিভাবে একজন ব্যক্তি নামাজও পড়ে না জিহাদও করে না, এক্ষেত্রে তাকে কোন বিষয় বলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? স্পষ্টত নামাজের কথা বলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যও তো কবর, আখেরাতের জীবনের ফিকির তৈরী করা আরো বেশি জরুরি। কিন্তু যদি সব কিছু বাদ দিয়ে জিহাদের ফরযিয়ত ও জিহাদে বের না হলে কি ধমকি এসেছে তার আলোচনা করলে ওই লোকের উপর কি প্রভাব পড়বে?

১৪. আলোচনার সূচনা মতবিরোধপূর্ণ বিষয় দ্বারা করা যাবে না। জরুরি হলো একমতের বিষয় দ্বারা আলোচনা শুরু করা। সম্বোধিত ব্যক্তি যে বিষয়কে হক ও কল্যাণকর মনে করে, বিশেষ করে সে যে বিষয়ের প্রবক্তা, সে বিষয়ে তার সাথে একমত পোষণ করা এবং তাকে উৎসাহ দেয়া। ওই ঐক্যের বিষয়কে মূল বানিয়ে তারপর যে বিষয়ের দাওয়াত দিতে চায় তা পেশ করা। যদি প্রথমেই মতবিরোধের আলোচনা করা হয় বিশেষ করে নিজেদের লোকের কাছে, তাহলে সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য কথা শোনা কষ্টকর হয়ে যাবে। তেমনিভাবে সব সংবেদনশীল বিষয়

একই মজলিসে আলোচনা করবে না। মাদউকে আস্তে আস্তে দাওয়াত দেয়া হবে, এবং তার মন মানসিকতা, হজম শক্তি অনুযায়ী তাকে বুঝাবে।

১৫. সম্বোধিত ব্যক্তির রুঢ় ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করবে। এবং শরয়ী সীমারেখা রক্ষা করবে। তার খারাপ ব্যবহারের পর তার সাথে ভাল ব্যবহার করা তার সাথে ইহসান। যেই পরিমান দয়া ও তাকওয়ার সাথে তাকে দাওয়াত দেয়া হবে ওই পরিমান দাওয়াতের প্রভাব তার উপর পড়বে। অন্যভাবে বললে আপনার দাওয়াত ওই পরিমান দলিলের ময়দানে কার্যকর প্রমাণিত হবে।

১৬. জিহাদি মিডিয়ায় আমাদের দাওয়াত সাধারণ হওয়া উচিৎ। যেহেতু আমাদের সম্বোধিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। এজন্য আমাদের কথাও তাদের বুঝ অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। তাদের বুঝের ঊর্ধ্বে যেন মোটেও না হয়। আমার কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বিশেষ ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া হবে না। তাদেরকে উদ্দেশ্য করেও কথা বলা হবে, তাদের রুচি অনুযায়ী বক্তব্য হবে, কিন্তু সাধারণ বক্তব্যে সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি।

১৭. জিহাদি মিডিয়া এবং দাওয়াতের মধ্যে কোন অনৈসলামিক মাধ্যম গ্রহণ করা যাবে না। উদ্দেশ্য এবং মাধ্যম উভয়ের মধ্যে যত বেশি শরীয়তের প্রতি লক্ষ রাখা হবে, সে পরিমান আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। এবং দাওয়াত বরকতময় হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে বিষয় শরীয়তে নাজায়েজ তা দ্বারা কখনও দাওয়াতের কোন ফায়দা হয় না। সুতরাং মিথ্যা ও ধোঁকা থেকে পরিপূর্ণ দূরে থাকতে হবে। শরীয়ত যে ক্ষেত্রে এর অনুমতি দিয়েছে সে ক্ষেত্র দাওয়াত নয়, জিহাদ। তাই আমাদের মিডিয়ায় কোন খবর বাড়িয়ে প্রচার করা যাবে না যার কোন বাস্তবতা নেই। এমন বাড়িয়ে প্রচার করার দ্বারা দাওয়াতের ক্ষতি হয়। এবং আমাদের সত্যবাদিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

১৮. যেই শ্রেণীর সাথে কথা বলা হবে, নিজেকে তাদেরই একজন করে কথা বলতে হবে। এর বিপরীতে সম্বোধিত ব্যক্তিদের মানসিকতা, আবেগ উদ্দীপনা ও তাদের অবস্থাদি জানা ব্যতীত তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে তারা কথা বুঝবে না। এবং তারা এই দাওয়াতের জন্য তাদের অন্তর খুলবে না। মঙ্গলগ্রহের দিকে তাকিয়ে থাকা ব্যক্তি মঙ্গলগ্রহের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে যদি পৃথিবীবাসির সমস্যার সমাধান করতে শুরু করে, তাহলে কিভাবে পৃথিবীবাসি তার

কথা মনযোগ দিয়ে শুনবে? সম্বোধিত ব্যক্তিরা সমস্যা যেই দৃষ্টিতে দেখে দাঈরও সে দৃষ্টিতে বুঝতে হবে। সম্বোধিত ব্যক্তিরা যেই সমস্যা ও বাঁধা দাঈর সামনে পেশ করে তা দাঈরও অনুভব করতে হবে। এই অনুভবের পরেই ওই বিষয়ের দাওয়াত দিবে শরীয়ত যাকে চায় এবং আমল যোগ্য হয়। রোগ সম্মন্ধে জানা ছাড়াই যদি চিকিৎসার পর চিকিৎসা দেয়া হতে থাকে। তাহলে রোগ ভালো হবে কিভাবে? আর এমন ব্যক্তিকে রোগী চিকিৎসক হিসেবে গ্রহণ করবে কেন? দাঈ লোকদের মাঝে থেকে একটু সতর্ক থাকলে বুঝতে পারবে কোন কথা কখন কার উপর প্রভাব ফেলবে। সম্বোধিত ব্যক্তির চেহারার রং পরিবর্তনই দাঈকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু হাজার মাইল দূরে বসে থাকা সম্বোধিত ব্যক্তিকে যখন দেখা যায় না এবং দাঈ তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে নিজের জযবার কথা বলতে থাকে তখন এই দাওয়াতের ফায়দা খুব কমই ইতিবাচক হয়।

১৯. একটি বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে, তা হলো: দাওয়াতের মধ্যে আমাদের শত্রু শুধু কুফুরী শাসনব্যবস্থা ও তার নেতৃত্ব এবং সশস্ত্র বাহিনীকে বর্ণনা করা। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হবে। তেমনিভাবে সেক্যুলারিজমও আমাদের আসল প্রতিপক্ষ। আর যেই দ্বীনদার শ্রেণী আমাদের বিরোধিতা করে তারা আমাদের শত্রু নয় তাদেরকে আমারা দাওয়াত দেব।

২০. দাওয়তের মধ্যে জিহাদ দ্বারা আমাদের আসল উদ্দেশ্য এ'লায়ে কালেমা বর্ণনা করা। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবন, সামাজিকজীবন, রাষ্ট্রীয়জীবনে শরীয়ত বাস্তবায়ন করা। মাজলুমদেরকে সাহায্য করা এবং কাফেরদের হাত থেকে মুসলিমদের ভূমিকে উদ্ধার করাও জিহাদের উদ্দেশ্য। তবে এগুলো সব মূল উদ্দেশ্যের (দ্বীনের বিজয়) অধীন।

২১. ইসলামী অধিকৃত ভূমি, বিশেষ করে বাইতুল মুকাদ্দাস ও হারামাইনকে মুক্ত করার কথা বলতে থাকা। তেমনিভাবে ফিলিস্তিনের উপর ইহুদিদের দখলদারিত্বে আমেরিকা ও আরব তাগুতদের সংশ্লিষ্ট থাকার কথা বারবার স্পষ্ট করতে থাকা। এ কারণে আমেরিকার প্রতি শত্রুতা পোষণ ও সারা দুনিয়ার মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে হামলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। কাশ্মীর উম্মতে মুসলিমার তাজা যখম। কাশ্মীরের জিহাদেরও দাওয়াত দেয়া হবে। এবং তাতে এজেন্সীগুলোর অধীনস্ততা থেকে বের

হওয়া এবং শরীয়তের মাকসাদের অনুগামী করার চেষ্টা করা। ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাহায্য সহযোগিতার কথা বলা দাওয়াতের বুনিয়াদি বিষয়।

২২. দাওয়াতের মধ্যে জিহাদি আন্দোলনের শত্রু কমানো এবং বড় শত্রু (কুফুরী শাসনব্যবস্থার লিডার ও রক্ষকদের) বিরুদ্ধে উম্মতকে এক করা।

২৩. পাকিস্তানে জিহাদের দাওয়াত শুধু দেশীয় তাগুতদের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের বিরুদ্ধেও হবে। এবং এটা বর্তমানে জরুরি হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু শুধু তাদের বিরুদ্ধেই হবে না। প্রথমত তাদের বিরুদ্ধে করতে হবে, যাদের যুলম, কুফুর এবং মুসলমানদের দুশমন হওয়ার ব্যাপারে মুসলমান জনসাধারণ সবাই একমত। শায়খ উসমা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র মতে যেই কাফেরের কুফুরী স্পষ্ট সাধারণ মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের দাওয়াতকে সহজে কবুল করে। কিন্তু যদি কোন কাফের ইসলামের পোশাক পরে। এবং ধোকা-জালিয়াতির মাধ্যমে কাজ করে তাহলে এই লোকের কুফুরী আসল কাফের থেকেও ভয়ঙ্কর হওয়া সত্বেও সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে অত সহজে মেনে নেয় না। আমেরিকা ও ভারত এমন কাফের রাষ্ট্রের মাঝে এমন যে, যাদের কুফুর, যুলুম, আগ্রাসন এবং মুসলমানদের শত্রু হওয়ার ব্যাপারে কোন সাধারণ মানুষেরও মতবিরোধ নেই। এই দুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আসল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত, এবং খুবই জরুরি। সাথে সাথে এই জিহাদি আন্দোলনকে শক্তিশালি করা, আঞ্চলিকভাবে বাতিল শাসনব্যবস্থাকে বুঝানো, এবং তার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে দাড় করানোর জন্যও জরুরি। আমেরিকা ও ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদ স্থানীয় তাগুতদের নেফাকি প্রকাশ করে দেয়। এর মাধ্যমে তাদের দ্বীনের সাথে শত্রুতাও প্রকাশ পেয়ে যায়

২৪. আমাদের সব কথা ও কাজ যেন জিহাদের সুউচ্চ উদ্দেশ্য ও দাবির বিশ্লেষণ করে হয়। দাওয়াতের মধ্যে এমন কোন কথা ও জিহাদের মধ্যে এমন কোন কাজ করা যাবে না, যার দ্বারা জনসাধারণের মনে আমাদের জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা তৈরী হয়। এবং ওই কথা ও কাজ না বুঝার কারণে ফেতনার কারণ হয়ে দাড়ায়। হযরত ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন: "...... লোকদের সামনে যদি এমন কথা বল যা তারা বুঝে না, তাহলে ওই কথা তাদের জন্য ফেতনার (হক থেকে দূরে সরার) কারণ হতে পারে।"

এজন্য এমন কোন কথা যা সম্বোধিত ব্যক্তি বুঝবে না তা বলা উচিৎ নয়। তেমনিভাবে যে কাজ চাই তা সঠিক হোক সাধারণ মানুষের মনে জিহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত ধারণার সৃষ্টি করে তা করা থেকে দূরে থাকা উচিৎ।

২৫. কাজের যিম্মাদার আসলে দাওয়াত। দাওয়াত একদিকে জিহাদ ও মুজাহিদদের উপকার করে, তেমনিভাবে তা অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে। যদি দাওয়াত মুজাহিদদের ইনসাফকারী হিসেবে পেশ করে, যেমন-তাদের জিহাদ ভালো উদ্দেশ্যে, তারা নিরপরাধ মানুষের রক্ত প্রবাহিত করে না। শুধু ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের হত্যা করে। তাহলে জিহাদের সমর্থক বাড়বে। আর যদি দাওয়াত মুজাহিদদের ঘোষণাকৃত বিষয়ের বিপরীত দেখায় তাহলে তা ইসলামের শত্রুদের উপকার করে। কার্যক্রমের জিম্মাদারি নেয়া যেহেতু খুবই সংবেদনশীল ও খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ, এজন্য দাওয়াতের দায়িত্ব যদি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের হাতে না থাকে তাহলে এই একটি কাজই জিহাদের দাওয়াত নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে।

২৬. দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে এমন বাক্য, দৃশ্যই দেখানো হবে, যার দাওয়াতের ক্ষেত্রে উপকারী প্রমাণিত হওয়াটা নিশ্চিত। যেক্ষেত্রে একটু সন্দেহ হবে, তা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাকে যা সন্দেহে ফেলে তা তুমি ছেড়ে দাও। এবং যে বিষয় শরীয়ত সম্মত হওয়া ও উপকারী হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত, সে বিষয় গ্রহণ কর।"

তাছাড়া এমন দাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন কোন কথা বা দৃশ্য দেখানো যাবে না, যার দুই অর্থ হয়, আপনি তো ভালো অর্থ নিলেন কিন্তু অন্যরা খারাপ অর্থ নিল, আর এর দ্বারা প্রতিপক্ষ প্রোপাগান্ডার সুযোগ পেল। দাওয়াত ও জিহাদি মিডিয়ায় সাধারণত শুধু ওই অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয়, যা সাধারণ মানুষ বুঝে। হতে পারে এটা আপনার বুঝের বিপরীত। এজন্য আপনার কথা দ্বারা মানুষ কি বার্তা পায় সেটাই হলো আসল। আর এটাকেই সঠিক ও উপকারী রাখার গুরুত্ব দিতে হবে। এর একটি উদাহরণ হলো গোয়েন্দা ও সৈন্যদের জবাই করার দৃশ্য, এমন ছবি প্রাকাশ করার দ্বারা জিহাদি মিডিয়ার ক্ষতি হয়, এবং মুজাহিদদেরকে নির্দয় প্রমাণকারীরা একটি সুযোগ পেয়ে যায়।

২৭. সাধারণ মানুষের সাথে আমরা দুঃখ কষ্ট পেরেশানীতে শরীক থাকব। তাদের সাথে আমরা অবস্থা অনুপাতে কথা বলব। উদাহরণস্বরুপ যদি তাদের উপর কোন

আসমানি মছিবত আসে, যেমন বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি। তাহলে আমরা তাদেরকে সান্তনা দেব। যদি তাদের জন্য কিছু নাও করতে পারি তাহলে কমপক্ষে কিছু ভালো কথা তো বলতে পারি। কিন্তু এই অবস্থায় যখন তারা খুবই কষ্টে আছে, সন্তানাদি নিয়ে একটু আশ্রয় খুঁজছে তখন যদি বলি যে, এসবই তোমাদের বদ আমলের ফল। তাহলে এটা কোনভাবেই ঠিক হবে না, আর এ ধরণের কথা বললে আমাদের কথা কে শুনবে? এই কথা তাদেরকে আরো গুনাহের দিকে ধাবিত করতে পারে।

২৮. মযলুম ব্যক্তিদের সাহায্য করা অবশ্যই আমাদের মৌলিক বিষয়। কিন্তু মযলুমের সাহায্যের আহবানে কোনভাবেই গোত্র বা ভাষাগত জাতীয়তার আশ্রয় নেয়া যাবে না। কোন এমন কথা বা এমন কাজ করা যাবে না। যার দ্বারা জাতীয়তার স্বীকৃতি থাকে। বরং দাওয়াতের মধ্যে দেশাত্মবোধ, গোত্রপ্রিতি, ভাষা ও সবধরণের জাতীয়তার অস্বীকৃতি থাকবে। এবং এক উম্মত হওয়ার আহবান হবে। মনে রাখতে হবে এমন স্বজনপ্রিতীর আশ্রয় কখনও জিহাদ ও উম্মতের পক্ষে থাকেনি। এটাকে সর্বদা জিহাদ ও উম্মতের শত্রুরা ব্যবহার করেছে। আমাদের সমর্থন ও বিরোধিতার মাপকাঠি কেবল ইসলমই হবে। ওই ইসলাম যা ভিনদেশ থেকে আসা ছুহাইব ও সালমানকেও ভাই বানায় এবং নিজেদের গোষ্ঠির লোক আবু জাহল আবু লাহাবকে শত্রু বানায়।

২৯. জিহাদি মিডিয়ার দায়িত্ব শুধু জিহাদের দাওয়াত ও জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা নয়। বরং তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো জিহাদের বুঝকে ব্যাপক করা, জিহাদের সংশোধন, মুজাহিদদের তরবিয়তও। সুতরাং কুফুরী শাসনব্যবস্থার প্রত্যেকটি দিকের সমালোচনা, এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ যেখানেই করা হবে সেখানেই মুজাহিদদের ফিকরি আখলাকি তরবিয়ত ও সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

৩০. বর্তমান সময়ের জিহাদি আন্দোলনের মাঝে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি মুক্ত মধ্যপন্থী মানহাজ ও বাড়াবাড়ির শিকার মানহাজের মাঝে পার্থক্য নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝানো জিহাদের দাঈদের জিম্মাদারী। ইন্টারনেটে দাওয়াত প্রদানকারী ভাইদের খুবই গুরুত্বের সাথে এই দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। তেমনিভাবে কোনটা জায়েজ কোনটা নাজায়েয, কার জান-মাল নিরাপদ আর কার জান-মাল অনিরাপদ , কোন কাজ দাওয়াতের জন্য উপকারী আর কোন কাজ জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও জিহাদের

জন্য ক্ষতির কারণ, জিহাদের দাঈ ভাইদের ইন্টারনেটে এ বিষয়ে আলোচনা করতে থাকা জরুরি। আমি আবারো বলছি এই কাজের জন্য শুধু জিহাদি আন্দোলনের গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরাম ও নেতাদের কিতাব ও দিকনির্দেশনার প্রতি লক্ষ করা হবে।

৩১. জিহাদের দাঈর জন্য শরয়ি ইলমের পর জরুরি ইলম হল ইতিহাসের ইলম। যদি দাঈ ইতিহাস সম্পর্কে অবগত থাকে, এবং তা থেকে খোলা মনে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে আশা করা যায় সে ভুলভ্রান্তি থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকবে। একজন জিহাদি বুজুর্গ আলেম বলেছেন 'ওই ব্যক্তি জিহাদি আন্দোলনের নেতৃত্বের যোগ্য না, যে ইতিহাসের জ্ঞান রাখে না'। নেতৃত্ব ও দাওয়াত ভিন্ন। কিন্তু জিহাদি আন্দোলনকে একটি পর্যায়ে উঠানোর ক্ষেত্রে পুরোপুরি আলাদাও না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ভাগ্যবান করতে চান তখন তাকে অন্যদের থেকে শিক্ষা অর্জনের তৌফিক দান করেন। তারপর ওই ব্যক্তি ওই বিশেষ রাস্তায় চলে যে রাস্তায় আল্লাহ পূর্ববর্তীদের নুছরত ও সাহায্য করেছেন। এবং ওই রাস্তা থেকে বেঁচে থাকে যে রাস্তায় চলে পূর্ববর্তীরা ব্যর্থ হয়েছে"।

বিগত সময় এই জিহাদের কাফেলা যেই গলি, রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করেছে, জিহাদের দাঈর সে গলি ঘুপচির কথা জানতে হবে। তার জানতে হবে দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে কোন কথা-কাজের কারণে সফলতা অর্জন করেছে। আর কোন কারণে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। এবং মুজাহিদরা সাধারণ মানুষের সহযোগিতা থেকে মাহরূম হয়ে গেছে। এটা জানা এই কারণে প্রয়োজন যে, কালকের ব্যর্থতার কারণ আজকের বিজয়ের কারণ হতে পারে না। যেই দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি দ্বারা পূর্বে ব্যর্থ হতে হয়েছে, আজও যদি সেই পদ্ধতিতে পথ চলা হয় তাহলে এর ফলাফল বিজয় হবে না। আজ আমাদের সামনে যেই সমস্যাবলি উপস্থিত এগুলোর সব না হোক অনেকগুলোই তাদের সামনেও এসেছিলো। তারপর আফগানিস্তান থেকে মালি, আলজেরিয়া, শাম ও ইরাক পর্যন্ত জিহাদি আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও কম নয়। জিহাদের দাঈ যদি হক পাওয়ার জন্য অস্থির থাকে এবং তার অন্তরে স্বজনপ্রিতির জং না লেগে থাকে তাহলে আশা করা যায় জিহাদি আন্দোলনের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার মধ্যে তার জন্য অনেক খোরাক রয়েছে। এবং এই ইলম তাকে উপকার করবে।

৩২. নিজেদের ইন্টারনেট পেইজগুলোতে শুধুমাত্র ওই খবরগুলোই প্রচার করা উচিৎ যার জায়েয হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে জিহাদ একমত। এমন কোন খবর প্রচার করা যাবে না যার ব্যাপারে উলমায়ে জিহাদ একমত নয়।

৩৩. শরীয়তবহির্ভুত কাজের ক্ষেত্রে চুপ থাকা হবে না, বরং জরুরি হলো এমন ক্ষেত্রে স্পষ্ট নিন্দা জানানো হবে। যদি কোন জিহাদি গ্রুপ থেকে এই কাজ প্রকাশ পায় তাহলে তাদের নাম উল্লেখ করা ব্যতীতই নিন্দা জানানো হবে, এবং নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করা হবে। আমাদের জন্য হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ। যখন খালিদ বিন ওয়ালিদের মত ব্যক্তি থেকে ভুল প্রকাশ পেল তখন হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকেন নি বরং তিনি আল্লাহ ও মানুষের সামনে নিজের এ থেকে মুক্ত থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন হে আল্লাহ আমি খালিদ যা করেছে তা থেকে মুক্ত ।

আমাদের মনে রখতে হবে শরীয়ত বহির্ভুত কাজকে শরয়ী প্রমানিত করা, এবং এর দায় স্বীকার করে ওই কাজকে মুজাহিদদের দিকে সম্পৃক্ত করা অনেক বড় খারাপ কাজ। আর এ ব্যাপারে চুপ থাকা আল্লাহর শাস্তি আসার কারণ। এবং এর দ্বারা জিহাদি কাজ নিশ্চিতভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এই কাজ যদি মুজাহিদরা না করে থাকে তাহলে এটা তো গোয়েন্দা বিভাগের কাজ, এক্ষেত্রে তো এজন্যও বিরোধিতা করার দরকার যাতে গোয়েন্দাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। এই নিন্দা দ্বারা জিহাদ বদনাম থেকেও বাঁচবে, এবং জিহাদের গতিও ঠিক থাকবে।

৩৪. ইন্টারনেট পেইজে বাড়াবাড়িকারীদের সংশোধন করা। যদি সংশোধন করা সম্ভব না হয় তাহলে তাদেরকে নিজেদের পেইজে জায়গা দেবে না। এবং অন্য লোকদেরকেও তাদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটে দাওয়াত প্রদানকারীরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক রেখে চলবে। খারাবি যে দিক থেকে আসুক তাকে তখনই বন্ধ করা সম্ভব যখন দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্ত ভাইয়েরা পরস্পরে এক থাকবে।

৩৫. দাওয়াতের মধ্যে দলীয় স্বজনপ্রিতি দূর করার জন্য খুব চেষ্টা করা হবে। একথা অন্তরে ভালোভাবে বসানোর খুব চেষ্টা করা হবে যে, দল আসল উদ্দেশ্য নয় বরং দল আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম। আমাদের উদ্দেশ্য হলো শরীয়ত প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তের অনুসরণ। আমার দল যদি এই উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সাহায্যকারী

হয় তাহলে এই দল পছন্দনীয়। আর যদি এই দল আমাকে আমার উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তাহলে এই দলকে মহব্বত করা, তার পক্ষে কথা বলা, তার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কোন কারণ নেই। মোটকথা দলের আসল অবস্থান নিজেও বুঝা অপরকেও বুঝানো। যাতে জামাতের বৈধ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, এবং এই পরিমাণ মর্যাদাও না দেয়া হয় যে, দলকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করে। এবং দলের জন্য শরীয়তের উদ্দেশ্যকে কুরবানি করে নিজ নিজ দলকে ত্রুটিমুক্ত দেখানো হয়।

৩৬. যেহেতু ফেতনা ফাসাদ যুলুম অবাধ্যতার মূল হলো কুফুরী শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থাই সমস্ত ভালো কাজের শক্তি ও আন্দোলনকে খতম করে। আর খারাপ কাজের হেফাযত করে। তা ছড়ায় ও ব্যাপক করে। এজন্য জরুরি হলো আমাদের ঘৃণা ও শত্রুতার মেরুদন্ড এই কুফুরী শাসনব্যবস্থাকে বানানো হবে। এবং সমস্ত সাধারণ মানুষ ও দ্বীনদারদের কলম এবং তীর ও ভাষার মোড় এর নেতা ও রাখালদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে। আর এটাই আমাদের দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য হবে। আর এটা তখনই হতে পারে যখন আমাদের দাওয়াত সবধরণের গ্রুপিং থেকে মুক্ত থাকবে। এবং দাওয়াতের মধ্যে আমরা শাখাগত মতপার্থক্যকে একদমই প্রশ্রয় দেব না। আমাদের মনে রাখতে হবে, যেভাবে শাখাগত মতপার্থাক্য দ্বারা গ্রুপিং করা কুফুরী শক্তিকে শক্তিশালি করে তেমনিভাবে এটা জিহাদের দাওয়াতের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

৩৭. ইন্টারনেটে যেই পেইজগুলো দলীয় গোড়ামিকে জাগ্রত করে, তা থেকে পরিপূর্ণ দূরে থাকা এবং মানুষকে দূরে রাখা জরুরি।

৩৮. মিডিয়ার মধ্যে জিহাদের দাওয়াতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে, কিন্তু আসলে পূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত থাকবে। তারপর যেই সমস্ত দ্বীনী বিষয়ে কুফুরী শাসনব্যবস্থা সরাসরি আক্রমণ করে, যেমন পর্দা, পবিত্রতা, এবং লজ্জা, ইসলামী জীবনাচার। এবিষয়ে মিডিয়ায় বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে। তেমনিভাবে কুফুরী শাসনব্যবস্থার প্রত্যেক দিক, গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা, বংশ শেষ করা, সেনাবাহিনীর অত্যাচার, অর্থনৈতিক দখলদারিত্ব ইত্যাদি সব কিছুর সমালোচনা করা হবে। এই শাসনব্যবস্থা সমস্ত খারাবির মূল তা স্পষ্ট করতে হবে। এর বিপরীতে শরয়ী শাসনের সৌন্দর্য, উপকারিতা, ফায়দা এবং এর হুকুম বর্ণনা করা হবে।

৩৯. ইলমে দ্বীনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্তকারী ওই কপালপোড়া, যে বাস্তবে দুনিয়ার জন্য নিজের দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে, যদি তাদের সমালোচনা করতে হয় তাহলে সংক্ষিপ্ত ও ভদ্র ভাষায় সমালোচনা করা হবে। এখানে মতবিরোধকারী সম্মানিত উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তি নয়। তাদের সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য ওই আলেম যারা দুনিয়াদার, দরবারি এবং খারাপ কাজে প্রসিদ্ধ ।

৪০. কোন ব্যক্তি যদি দ্বীন ও জিহাদি আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তার অবস্থান ভালো হয়, এবং দ্বীনের খেদমতে সে প্রসিদ্ধ হয়, তাহলে জিহাদি মিডিয়ার মধ্যে তার নাম উচ্চারণ করা ছাড়াই তার কাজের বিরোধিতা করা হবে। এভাবে করার দ্বারা মানুষ শেষ পর্যন্ত তার ক্ষতিকর হওয়াটা বুঝবে। তার প্রতি তাদের মানসিকতা পরিবর্তন হবে। তবে এর বিপরীত যদি মানুষ তার ভালো কাজে সন্তুষ্ট আর আমরা যদি তার নাম ধরে অথবা ছবি দিয়ে তার গালমন্দ করি তাহলে মানুষ তার পক্ষে কথা বলবে আর আমাদের কথা শুনবে না।

৪১. দাওয়াতের মধ্যে সর্বদা পার্শ্ব লড়াই (যেমন কুফুরী শাসনব্যবস্থা ও তার রক্ষকদেরকে রেখে অন্য শত্রু যেমন রাফেজিদের বিরুদ্ধে সসস্ত্র যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা) থেকে বিরত থাকা হবে। বাস্তবতা হলো আমাদের সমস্ত পার্শ্ব শত্রুসহ সমস্ত ফেতনার হেফাযত এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় বাঁধা হলো এই কুফুরী ব্যবস্থা। এই কুফুরী শাসনব্যবস্থার রক্ষকরা সর্বদা চায় যেন দ্বীনদারদের কামানের মুখ তাদের দিকে না ফিরে। এজন্য আমেরিকা হোক বা স্থানীয় তাগুত হোক সর্বদা এই চেষ্টা করে যে, মুজাহিদরা পার্শ্ব যুদ্ধে জড়িয়ে পরুক। আর নিজেরা বেঁচে যাক। জিহাদি আন্দলোন এক হয়ে যদি সমস্ত শক্তি ও বিশেষ মাধ্যম এই শাসন ও তার নেতাদের ধ্বংস করায় ব্যয় করে, তাহলেই শুধু দ্বীন ও উম্মতের ফায়দা। যেদিন এই বাতিল শাসনব্যবস্থা ও তার লিডাররা ধ্বংস হয়ে যাবে সেদিন বড় থেকে বড় পার্শ্ব শত্রুও মূখ তুলে তাকাতে পারবে না। বরং তখন সে নিজের সংশোধনের চেষ্টা করবে অথবা নিজের দোষ আড়াল করতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং দাওয়াতের ক্ষেত্রে পূর্ণ মনোযোগ বাতিল শাসনব্যবস্থার প্রতি থাকবে। যদি কোন পার্শ্ব যুদ্ধে জড়াতেই হয় তাহলে শুধু আত্মরক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। তারপর আবার যত দ্রুত সম্ভব আসল যুদ্ধের দিকে ফিরে আসবে। ইমারাতে ইসলামিয়া

আফগানিস্তানও শুরু থেকে এই হেকমতকে সামনে নিয়ে চলছে। এবং এর ভালো ফলাফলও স্পষ্ট হয়েছে।

৪২. জিহাদি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা আমরা মানুষের জন্য সহজ করবো। যদি কোন ব্যক্তি জিহাদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও মূলনীতির সাথে একমত হয়ে যায়, এবং সে নিজেকে কোন বিশেষ মজমুআর কাছে অর্পণ করে, তাহলে তার উপর অতটুকই বোঝা চাপানো যায় যতটুক সে বহন করতে পারে। বেশি করার শক্তি থাকলে সুন্দরভাবে উৎসাহ দেয়া যাবে, কিন্তু এটা মোটেও উচিৎ হবে না, যদি আমাদের থেকে মানুষ এই পয়গাম পায় যে, জিহাদি আন্দোলন শুধু তাকেই কবুল করে, যে তার সবকিছু ছেড়ে জিহাদে যোগ দেয়। যার মধ্যে এই হিম্মত নেই তার এখানে কোন কাজ নেই। যে যতটুক সাথে থাকতে পারে শুকরিয়ার সাথে গ্রহণ করা হবে। সুতরাং সবকিছু আল্লাহর জন্য কুরবানি করার উৎসাহ দেয়া ভিন্ন বিষয়। আর এটা দরকারও। কিন্তু যে সামান্য পরিমাণে সাথে থাকে তাকে বেশি পরিমাণে সাথে থাকায় বাধ্য করা মোটেও ভালো কাজ নয়।

৪৩. দাওয়াতের ময়দানের ভাইয়েরা দাওয়াতকেই আসল জিহাদ মনে করবে না। এবং এর উপর সীমাবদ্ধও থাকবে না। তাদের জন্য লড়াই ও শাহাদাতের গুরুত্ব ও ফযিলত স্বরণ রাখা ও এবং জিহাদের ময়দানে যাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা জরুরি।

৪৪. দাওয়াত হোক, জিহাদ হোক, দাঈর নিজের তরবিয়ত হোক, কোন একটি ভালো জামাতের সাথে যুক্ত অনুগত থাকা জরুরি। ইন্টারনেটে দাওয়াত প্রদানকারীরা নিজেরাও জিহাদি আন্দোলন ও জিহাদি নেতাদের সাথে আমলিভাবে যুক্ত থাকবে। অন্যদেরকেও যুক্ত করার চেষ্টা করবে। জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কাজ করায় অনেক ক্ষতি আছে। এটা মোটেও ভালো কাজ না।

৪৫. ইন্টারনেট দাওয়াতের ময়দান, জিহাদ ও মুজাহিদদের ক্ষতি করার একটি কার্যকর মাধ্যম। এখানে জিহাদের দাওয়াতের বেশে গোয়েন্দারা দাওয়াতকে নষ্ট করা, জিহাদি দলে নিজেদের গোয়েন্দা প্রবেশ করানোর জন্য এবং মুজাহিদদের গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা করে। তাই প্রথমত নিজেরা সতর্ক থাকা, অন্য ভাইদেরকে সতর্ক করা জরুরি। জিহাদের দিকে আহবানকারী প্রত্যেককে বিশ্বাস করা যাবে না। দ্বিতীয়ত শত্রুদের এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্য জিহাদের

ময়দানের প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রাখবে। তাযকিয়ার গ্রহনযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বন করা। এবং নিজে মানহাজের ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করা। নেটের জগতে কাউকে অন্ধ বিশ্বাস করা যাবে না। নেটে আপনার সাথীর পদ্ধতি গ্রহণ করাও অসম্ভব নয়। এ আশংকা সর্বদাই থাকে যে, গোয়েন্দাদের কোন ব্যক্তি আপনার সাথীর লেখার পদ্ধতি নকল করবে। এজন্য নিজের সাথির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করবে। এবং অফলাইনে ও অন্যান্য মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে।

৪৬. সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। সুতরাং নেটের দাঈ নেটে বসার আগে নিজের কাজ নির্ধারণ করে নিবে। নিজের নির্ধারিত কাজ সময় ব্যতীত আগে-পরে আর কিছু করবে না। এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে সময় অপচয় বেহুদা কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪৭. শুধু নেটের দাওয়াতকে আসল মনে করবে না। দাঈগণ অফলাইনে চেইনের মাধ্যমেও দাওয়াত ছড়ানোর চেষ্টা করবে। এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর ও বেশি উপকারী

৪৮. দাওয়াতি দলিল-দস্তাবেজ যেন বিভিন্ন ধরণের হয়। যাতে দাওয়াত ও জিহাদের লাইব্রেরীতে পরিমাণের সাথে বিষয়বস্তুও বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত জমাকৃত দলিল-দস্তাবেজ যেন সংরক্ষিত থাকে। ইন্টারনেটে আমাদের সমস্ত দলিলপত্র সুবিন্যস্তভাবে থাকা উচিৎ। যাতে সাধারণ পাঠক থেকে উচ্চস্তরের পাঠক পর্যন্ত সবাই জরুরি বিষয়গুলো সহজে পেয়ে যায়।

৪৯. ইন্টারনেটে উপস্থিত পেইজগুলোতে বন্ধু সার্কেল গঠিত হয়। সাধারণত তারাই আমাদের লেখাগুলো পড়ে। কিভাবে এই বন্ধু সার্কেলকে বাড়ানো যায় তার ফিকির করা। আর কিভাবে বেশি বেশি মানুষ আমাদের প্রাথমিক লেখাগুলো পড়ে তার চেষ্টা করা।

৫০. ইন্টারনেটে দাওয়াত প্রদানকারী ভাইয়েরা অফলাইনে নেককার মানুষের ছোহবতে থাকা জরুরি। যাতে ফেতনা থেকে বাঁচা যায়। চিন্তা-চেতনা ঠিক রাখার সাথে সাথে নযরের হেফাযতও হয়। এটা জরুরি বিষয়। নযর হেফাযতের দ্বারা মন মস্তিষ্ক পবিত্র থাকে, কাজে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

৫১. সর্বশেষ আবেদন এই যে, নিজেদের দাওয়াত ও পদ্ধতির সর্বদা মুহাসাবা করতে থাকবেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে।

এই সামান্য কিছু কথা দাওয়াতের মানহাজ সম্পর্কে বলার ছিলো। এবিষয়ে এখানেই লেখা শেষ করলাম। আল্লাহ আমাদের ইখলাছ দান করুন। আমাদের কথা ও কাজ দ্বারা দ্বীন ও উম্মতের ফায়দা দান করেন। দাওয়াত ও জিহাদের প্রত্যেক কথা ও কাজে আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। দ্বীন ও জিহাদের সত্যিকারের খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করেন। আমাদেরকে তার দীদার ও তার রসূলের সঙ্গ থেকে মাহরুম না করেন। আমিন।

****